অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক একটি রক্তাক্ত ইতিহাস
বুখারা-সমরকন্দের
রক্তাক্ত
ইতিকথা
মোল্লা মেহেরবান

বুখারা-সমরকন্দের
রক্তাক্ত
ইতিকথা

মূল
আযম হাশেমী

ভাষান্তর
মোল্লা মেহেরবান

দেশ-জনতা প্রকাশনী

বুখারা-সমরকন্দের

রক্তাক্ত ইতিকথা

মূল

আযম হাশেমী

ভাষান্তর

মোল্লা মেহেরবান

প্রকাশক

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে জহীর

প্রকাশকাল

সফর ১৪২২ হিজরী

মে ২০০১ ইংরেজী

দেশ-জনতা প্রকাশনী
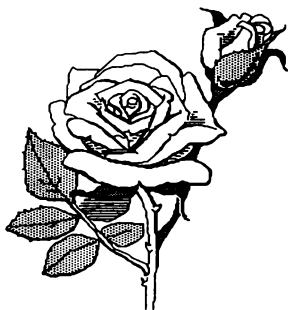
মূল্য ঃ ৫৫.০০ (পঞ্চান্ন) টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

সে অনেক দূরে থাকলেও তাকে সব সময়
কাছে মনে হয়, ভাই না হয়েও আপন
ভাইয়ের মতো মনে হয়, অসংখ্য গুণের
অধিকারী সেই স্নেহবরেষু
মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন খান
-এর করকমলে।

— মোল্লা মেহেরবান

باسم ذى القوة المتين

পাঠকের কাঠগড়ায় জবানবন্দী

হামদ ও সালাতের পর–

এই বইয়ের চরিত্রগুলোতে দশ শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। ১. চরম ধর্ম-বিদ্বেষী, ধর্মহীন ও বস্তুবাদী কমিউনিষ্ট। ২. ধর্মহীন কমিউনিষ্টদের মতবাদ প্রচারকারী কুটিল ইয়াহুদী অথবা ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য মুরতাদ শ্রেণীর প্রকাশ্য চাটুকার ও দালাল। ৩. পাষাণ-হৃদয় জালিম সেনাবাহিনী। ৪. সেবা কিংবা ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার বেশধারী কমিউনিজম ও স্যোশালিজম প্রচারকারী। ৫. কমিউনিজম ও স্যোশালিজমের দালাল, চাটুকার ও তল্পীবাহক তথাকথিত উলামা গ্রুপ। ৬. কমিউনিজমের প্রাথমিক ও বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও প্রচারনায় বিভ্রান্ত উলামায়ে কিরাম। ৭. দ্বীনদার নিরীহ মুসলমান। ৮. কমিউনিজমের প্রচারনা ও প্রতারণার শিকার আম-জনতা। ৯. প্রাজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও দেশ-প্রেমিক উলামা-মাশায়িখ। ১০. খোদা-ভীরু জানবাজ যুবসমাজ।

আমাদের দেশে বর্তমানে কমরেডদের কমরেট হয়ে গেছে। খোদার শুকর! এদের দৌরাত্ম থেকে ফিল্ হাল কিছুটা হলেও আমরা মুক্ত। কিন্তু তাদের খালাতো ভাইরা তথা বস্তুবাদীরা এবং উপরের অন্যান্য প্রকারের লোকদের অভাব নেই। তাই এই বই থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে।

এই রক্তাক্ত ইতিকথার সম্বোধক প্রথমতঃ সেসব নাম সর্বস্ব “মুফতী মাওলানা”, যাঁরা জ্ঞানে-অজ্ঞানে স্যোশালিজম তথা ধর্মদ্রোহী-রাষ্ট্রদ্রোহী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতের খেলনায় পরিণত হচ্ছেন। যদি তাঁদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ঈমান থেকে থাকে, তাহলে তাঁদেরকে আমরা মহান আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলতে চাই যে, “আপনারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটি বার চিন্তা করে দেখুন যে, আপনারা কী ভয়ানক খেলা খেলছেন। আপনারা কোন্ ধরনের মানুষের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছেন। খোদার দোহাই! সঠিক পথে ফিরে আসুন। দ্বিতীয়তঃ দেশের সেসব মুসলমান আমাদের সম্বোধক, যাঁরা স্বীয় দ্বীন, তাহজীব ও তামাদ্দুনকে দুশমনের থাবা থেকে বাঁচানোর এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে জিন্দেগী কাটানোর জন্য বিভিন্নভাবে প্রাণবাজি রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যেন আমাদের এই পুস্তিকা মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং নিজেদের ও তাঁদের হালতের “মুয়াযানা” (তারতম্য) করেন এবং “মাশ্‌আলে রাহ” (লক্ষ্যবস্তু) নির্ধারণ করে নেন।

এই মুহূর্তে আপামর জন-সাধারণের কাছে সবিনয় নিবেদন করবো– যারা দেশকে বুখারা-সমরকন্দ বানানোর দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নে আদাপানি খেয়ে মাঠে নেমেছে– তাদের বেশভূষা দেখে, মিষ্টি মধুর শ্লোগান শুনে ও মায়া কান্নায় যেন ধোকা না খেয়ে যান। ওদের বাহ্যিক চাকচিক্য, জনোবল-মনোবল ও বাক আড়ম্বরতা ইত্যাদি সবকিছু বদ্‌দ্বীনী, কুফর ও ইল্‌হাদের পানি সাদৃশ্য মরীচিকা বৈ কিছু নয়। দূর থেকে তা পানির সমুদ্র মনে হয়। আসলে তা পানির সমুদ্র তো দূরের কথা; বরং চির পানি কাংগাল খা-খা মরুভূমির মরীচিকা। মনে রাখা দরকার, স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃকুফরী শক্তি যতোটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অধিক ভয়াবহ পশ্চিমাযাদা দ্বীনহীন ও দ্বীন-বিদ্বেষী মুসলমান। এরাই সমাজে মীর জাফর ও মীর কাসিম রূপে আভির্ভূত হয়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিলামে বিক্রি করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না।

তাই সময় থাকতে প্রকৃত দেশ-জাতি ও স্বাধীনতা প্রেমিক জনতার উচিত, হিকমত ও মহব্বতের মাধ্যমে, নরমে-গরমে তথা দৃঢ়পদে ও সুকৌশলে সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রীতি ও আল্লাহপ্রীতি, নবীপ্রীতিভিত্তিক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত এগিয়ে চলা। ইন্ তান্‌সুরুল্লাহা ইয়ান্‌সুরুকুম ওয়ায়ু সাব্বিত আক্বদা মাকুম। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ৭)

হাদীয়ে যমান হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর সেচ্ছাসেবকদের পরাজয় নেই। তাঁরা তো ইবাদাত হিসাবে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে যান। আর ইবাদাতে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই উঠে না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিই এতে মোক্ষম উদ্দেশ্য।

বইতে যতো ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, সবই আমার। আর তজ্জন্য আমি অকপটে পাঠকের কাঠগড়ায় আলাল্ ই'লান মার্জনা প্রার্থনা করছি। যে কোন ধরনের ভুল জানানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। পক্ষান্তরে এতে যদি কোন সৌন্দর্য থেকে থাকে, তাহলে তা সবকিছু আমার প্রভু আল্লাহ জাল্লা শা-নুহুর। পরিশেষে সবার কাছে দু'আ কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আল্ হামদুলিল্লাহি আউয়ালান্ ওয়া আখীরান, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা-রসূলিহীল কারীম।

মা'আস্‌সালাম–

মোল্লা মেহেরবান

সূচীপত্র

প্রবেশ

"বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা" বলতে শুধু দু'টি শহরের অতীত কাহিনী নয়; বরং এর দ্বারা তুর্কিস্তানের সেই মহান লীলাভূমি উদ্দেশ্য; ইসলামী ইতিহাসে যা "মা-ওয়ারা উন্-নাহ্র" নামে সুপ্রসিদ্ধ।

যতোদিন এই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য তথা অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততোদিন পরম শ্রদ্ধার সাথে বুখারা-সমরকন্দের নাম আলোচিত হবে। কেননা, এই মহান দুই শহরের সাথে মিল্লাতে ইসলামিয়ার এক আজীমুশ্‌শান ইতিহাস সম্পৃক্ত। এ মহান ভূমিতে উম্মাতের জগদ্বিখ্যাত বক্তিবর্গ জন্ম নিয়েছেন; যাঁদের কর্ম-কীর্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসল মহা-প্রলয়ের দিবস নাগাদ অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে। তা থেকে লাভবান হবে বিশ্বমানবতা যুগ যুগ; শতাব্দির দর শতাব্দি। "বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা" উক্ত লীলাভূমির বাস্তব ও হৃদয়বিদারক অতীত গাঁথার কিয়দাংশ।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে কি ঘটেছিলো অতীতে সেই বুখারা-সমরকন্দে? কেন রক্তাক্ত তার অতীত? কোন্ সামুদ্রিক ঝড় হানা দিয়েছিলো সেই মা-ওয়ারা উন্ নাহরে? কোন্ টর্নেডো সেই পবিত্র ভূমিকে তছনছ করে দিয়েছিলো? সেই সরজমীনে যখন স্যোশালিজমের ভূত চেপে বসেছিলো, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সময়কাল কিভাবে কেটেছিলো? ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমির অধিবাসীরা ধর্মবিরোধী ও নাস্তিক্যবাদী সেই মতবাদকে কি নজরে দেখেছিলো? মুসলিম জাতির বিবেক উলামায়ে কিরাম কিভাবে মেনে নিয়েছিলেন সেই চ্যালেঞ্জকে?....... মুখাতাব! দুঃখিত। ধারাবাহিকভাবে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি না। স্রেফ সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বলছি। আর তাও আযম হাশেমীর ভাষায়, যা তিনি স্বয়ং দেখেছেন, সরাসরি শুনেছেন অথবা খোদ উক্ত ঘটনার শিকার হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। অবশেষে যখন জুলুমের সীমা বর্ণনাতীতভাবে বেড়ে গেলো এবং পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলো- তখন অকস্মাৎ কোন এক গভীর রজনীতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশে- অচেনা ও গন্তব্যহীন সফরে....।

কে এই আযম হাশেমী? কি তার পরিচয়? কেন তিনি এসব কথা বলতে গেলেন? তিনি কি কোন লেখক বা ঐতিহাসিক?......

– আযম হাশেমী সেই সহস্রাধিক (তৎকালীন বৃহত্তর) তুর্কী মুহাজিরদের একজন, যারা সৌদী আরব এবং পশ্চিম ইউরোপে বসবাস করছেন। তিনি আফগানিস্তানের পথ দিয়ে উপ-মহাদেশে আসেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি কোন লেখক কিংবা ঐতিহাসিক নন। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর যাবত তিনি এই হৃদয়-বিদারক ইতিকথা সযতনে হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে রাখেন। তাঁর বন্ধু মহলের অনেকেই তাঁকে এই রক্তাক্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের দরজা খুলে সেই রক্তমাখা সফরনামা বর্ণনা করার হিম্মত পাচ্ছিলেন না। ঠিক ইতোমধ্যে যখন এই উপ-মহাদেশেও লাল সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা স্যোশালিজমের শ্লোগান বুলন্দ করলো এবং পশ্চিমাযাদা মুসলমানরা ছাড়াও একশ্রেণীর তথাকথিত "মুফতী-মাওলানা" তাদের তল্পীবাহক হিসাবে মাঠে অবতীর্ণ হলেন, তখন এসব দেখে আযম হাশেমী শিউরে উঠলেন। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়-বদন পুনরায় রক্ত অশ্রু বহাতে শুরু করলো। তিনি দেখলেন, বুখারা-সমরকন্দে লাল সাম্রাজ্যবাদীরা যে খেলা খেলেছিলো, এখানেও সেই অভিন্ন খেলা শুরু হয়েছে।

সেখানে স্যোশালিজমের ধ্বজাধারী ও গোমস্তা-দালালরা সামাজিক -অর্থনৈতিক সমতা-স্বাধিকার ও দীন-মজুর এবং মেহনতী মানুষের জন্য মায়াকান্না কেঁদে ও সমবেদনার শ্লোগান দিয়ে মাঠে নেমেছিলো। সাথে সাথে তথাকথিত কিছু মোল্লা-মৌলবীও তাদের তল্পীবাহকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলো। তুর্কিস্তানের মুসলমানরা তাদের কাছে চরমভাবে ধোকা খেয়ে যান। তারা স্যোশালিজমকে নিরেট একটি সমাজব্যবস্থা মনে করে। কিন্তু যখন পরিপূর্ণভাবে এই প্রোতাত্মা তাদের উপর সওয়ার হয়, সে যখন মুসলমানদের তাহজীব-তামাদ্দুন আদর্শ-কৃষ্টি, স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব সবকিছু এক ঘোটে গিলে ফেলে, সে মূহুর্তে তথাকার মুসলমানদের ইয়া-লাইতানী কুন্‌তু তুরাবা– "হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম" ছাড়া আর বেশী কিছু বলার ছিলো না।

আযম হাশেমী উপ-মহাদেশের মুসলমানদের বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ মানসে স্যোশালিজমের এপিঠ-ওপিঠ খুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিলেন। অবশেষে তার বুকে চেপে রাখা বিচ্ছিন্ন দুঃখ-বেদনার স্মৃতিগুলো কথার মাল্লে গেঁথে দিলেন ফার্সী মিশ্রিত উর্দূতে। আজ তার সেই লেখাটি সংগ্রহ করতঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা করে পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম। আল্‌ হামদুলিল্লাহ! ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা-রসূলিল্লাহ।

গভীর রাতে অচেনা পথে

সেই রাতটি আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। আটত্রিশ বছর গত হলো। আজ অবধি সেই রাতটির প্রত্যেকটি মুহুর্তের কথা ও কাজগুলো আমার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিবস-রজনীর হাজারো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের পরও সেই রাতটির স্মৃতিগুলো হৃদয়ের পর্দায় অম্লান হয়ে আছে। কখনও কখনও মনে হয় যেন, স্নেহময়ী আম্মাজান বাড়ীর বাউণ্ডারীর দেয়াল ঘেসে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় দিচ্ছেন এবং বলছেনঃ "বেটা! মহান আল্লাহ্ তোমার হিফাজত ও রক্ষনাবেক্ষণ করুন! আমার নসীহতসমূহ ভুলিও না; অন্যথায় আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবো ....।"

১৯৩১ সালের কথা। ফেব্রুয়ারীর শেষ কিংবা মার্চের প্রথম তারিখ ছিলো। আমার কামরায় খাটে ঘুমিয়ে ছিলাম। ইতোমধ্যে আম্মাজান আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে তুললেন। আমি চোখ মেলে উঠে বসলাম। ঘুম ভাংগা মাত্রই ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকী রইলো না, যার জন্য কদিন যাবত আমরা মা-ছেলে সলা-পরামর্শ করছিলাম। এই গভীর রজনীতে মা-জননী এজন্যই আমায় জাগিয়েছেন।

আম্মাজান আমাকে উজু করতে বলে মশকে পানি ভরতে লেগে গেলেন। আমি পবিত্রতা হাসিল করলাম। এদিকে আম্মাজানও উজু করলেন। মা-বেটা দু'জনই প্রভুর দরবারে লুটে পড়লাম। দু' রাকআত নামায আদায় করলাম। আম্মাজান দু'আ-দরূদ পড়ে আমাকে ফুঁক দিলেন। তারপর তিনি রান্নাঘরে গেলেন। দশ-পনের মিনিট পর এক হাতে দস্তরখানা ও অপর হাতে পাখীর গোস্তের সিক-কাবাব নিয়ে এলেন এবং বললেনঃ "বেটা খানা তো খেয়েছো। নাও, এটি খেয়ে নাও।" অতঃপর তিনি নিজ হাতে তা খাওয়ালেন। খানা শেষে সকরুণ কণ্ঠে আম্মাজান বললেনঃ "কলিজার টুকরা! ওঠো! আপন নিষ্পাপ ভাই-বোনদেরকে জীবিত দেখে নাও। হতে পারে এটাই শেষ দেখা।"

আমি ধীরে ধীরে তাদের খাটের দিকে এগুলাম। মাসুম ফিরিশতাতুল্য অবলা ভাই-বোন আমার দুনিয়ার সর্বোপরি খোঁজ-খবর থেকে বে-খবর হয়ে বিভোর ঘুমে মগ্ন। নিষ্পাপতার জ্যোতি যেন তাদের মুখে খেলা করছিলো। একজন একজন করে সবার কপালে হাত রাখলাম। অতঃপর সবার মঙ্গল ও সফলতার জন্য হৃদয় ভরে দু'আ করলাম। আমার জন্য ভীষণ ধৈর্যের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। হৃদয়ের প্রেম ও ভালবাসার সাগরে যেন কাল বৈশাখী তুফান বয়ে যাচ্ছিল। চক্ষু দু'টি বাঁধন ছাড়া নদীর মতো অবলীলায় অশ্রু বইয়ে যাচ্ছিলো। আম্মাজান যেন আমার চোখের পানি দেখতে না পান, সে জন্য

অনবরত চোখ মুছছিলাম। লক্ষ্মী মা আমার পঁয়ষট্রি বছর বয়স্কা ছিলেন। কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট ও তপ্ত-তরুণের মতো নির্ভীক ও অটল ছিলেন।

সময় গড়িয়ে চলছে। নীরব-নিস্তব্ধ রজনী। আম্মাজান বেশ কিছুক্ষণ একেবারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আমার পাণে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কাছে ডাকলেন। মনে হচ্ছিলো আবেগ ও স্নেহ মমতার ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন; তবে তা সামলে নিতে চেষ্টা করছেন। আমার জন্য তিনি বালিশের মতো ছোট্ট একটি বিছানা বেঁধে নিলেন এবং হাটা শুরু করলেন। আমিও নীরবে তার পিছে পিছে চললাম। কামরা থেকে বের হয়ে বারান্দায় এলাম। বারান্দা থেকে বাগানের দিকে রুখ করলাম। বাগানের গেইট খোলা ছিলো। আমরা বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এখন আমরা খোলা আকাশের নীচে চলছি। ঝরে পড়া গাছের পাতা মাড়িয়ে নীরব-বাকহীন দুটি মানুষ এগিয়ে চলছি অচেনা ও আশা-ভরসাহীন কোন গন্তবে। হঠাৎ আম্মাজান বৃক্ষরাজির মাঝে দাঁড়িয়ে গেলেন। অধির স্নেহ-মমতায় আমার কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন "বেটা! আমার এই বৃদ্ধ বয়সের তুমি আমার সহায়- অন্ধের যষ্টিতুল্য; তুমি আমার অনেক আশা-স্বপ্নের ঠিকানা। কিন্তু পরিস্থিতি তোমার সামনে স্পষ্ট। এই প্রিয় জন্মভূমিতে একজন সাচ্চা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থেকে আমার খিদমাত করতে পারবে না। এজন্য আমি দ্বীন ও ঈমান এবং প্রিয় জন্মভূমির খাতিরে কোন স্বাধীন মুসলিম দেশে তোমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। তবে একটি শর্ত ভুলে যেওনা। সেটা হলো- যথা সম্ভব এই তুর্কিস্তানের মুসলমানদের অসহায়তা এবং এখানে দ্বীনের সাথে যে বেইজ্জতী করা হয়েছে, তা সকল মুসলমান ও স্বাধীন জাতিসমূহের কাছে পৌঁছে দিও। বৎস! উজু করা ব্যতীত কখনো তোমাকে দুধ পান করাইনি। যদি তুমি এই উদ্দেশ্যকে কখনো ভুলে যাও, তাহলে কখনো আমি সন্তুষ্ট হবো না। মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব তার ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্যেই মনুষ্যত্ব নিহিত।"

আম্মাজান আমাকে ছোট্ট একটি বিছানা দিলেন। আনুমানিক দু'সের ওজন হবে। অতঃপর বললেনঃ এটিকে হেফাজত করিও। বিশেষ করে এর ভিতরে রাখা কুরআন শরীফটি খুব যত্নে রাখিও। ওতে কভার লাগিয়ে নিও। গন্তব্যে পৌঁছার পর পুরানো বাইণ্ডিং ও কভারটি নিজ হাতে খুলে নতুন করে বাইণ্ডিং ও কভার করে নিও। আর পুরানো কভার ও বাইণ্ডিংটি জ্বালিয়ে দিয়ে ছাইগুলো কোন নদীতে কিংবা কুপে ফেলে দিও।

আম্মাজান আরো বললেন ঃ "দেখো! কখনও মাতৃভূমিকে ভুলবেনা। কোন বস্তু যেন তোমার জন্মভূমির প্রেমকে ভুলিয়ে দিতে না পারে। দরদীদের দরদ ও মহব্বতকে ভুলিও না। যে তোমার খোদার দুশমন ও তোমার জন্মভূমি

ছিনতাইকারী, সে কখনও তোমার বন্ধু ও হিতাকাংখী হতে পারে না। ভীতু ও অকর্মা ব্যক্তিরা কখনও কাংখীত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। মৃত্যুতো একদিন আসবেই। ঈমানের চেয়ে মুল্যবান বস্তু জগতে নেই। সাহসী সন্তানেরা তার লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে ছিটকে পড়ে না। দৃঢ়তা-সাহসিকতা ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এগিয়ে চলো–সফলতা হাতছানি দিয়ে ডাকবে। যেসব লোক এসব কথার প্রতি কোন গ্রাহ্য করে না, তার জীবনের কোন মুল্য নেই।"

আম্মাজান দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমাকে উপদেশ-নসীহত করতে থাকলে রাত অতিবাহিত হতে থাকলো। চারিদিকে একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ। কখনও কখনও মুরগের ডাক শোনা যাচ্ছিলো। পূর্ণিমার সময় ছিলো। চাঁদটা পশ্চিমাকাশের দিকে গা লেলিয়ে দিতে লাগলো। বৃক্ষের ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে চললো। বাগান পেরিয়ে বাগানের বাউণ্ডারীর দেয়ালের নীচে পৌঁছলাম। আম্মাজান দু'হাত তুলে দু'আ করলেন। অতঃপর আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলাতে লাগলেন। পরিশেষে কাঁধে থাপ্পর মেরে বললেন "যাও বেটা! মহান আল্লাহ তোমার সঙ্গী ও মদদগার হবেন।"

আমি সর্বশেষ বাগানের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম। এই বাগানের অসংখ্য চারাগাছ আমি নিজ হাতে লাগিয়েছি। অসংখ্য সকাল-সাঝ রক্ত-ঘাম একাকার করে এতে পানি সিঞ্চন করেছি। আহ! এই বাড়ী! এই বাড়ীতে জন্ম নিয়েছি। এখানে আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। আজ এই দীপ্ত তারুণ্যে সেই প্রিয় স্বপ্নের জন্মস্থান ছেড়ে কোন অজানার পথে পাড়ি জমাচ্ছি। এই বাড়ীটি আমাদের শত শত বছরের বংশীয় ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রতিটি পাথরে আমার শৈশব স্মৃতি অংকিত রয়েছে। হায়! আজ কতো কথাইনা মানসপটে ভেসে উঠছে। স্মৃতিরা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ওরা যেন আমাকে বলছে, "কিরে আযম! কোথায় যাস? আয় লুকোচুরি খেলি। ওহ জন্মভূমি! তোমার নাফরমান সন্তানরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিলো না। বাঁচতে দিলো না স্বাধীনভাবে। খোদা! শক্তি দাও, অধিকার আদায়ের। এই নিজ জন্মভূমিতেই আজ আমরা পরাধীন– সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

আম্মাজানকে সালাম আরয করে দেয়ালের উপরে উঠে লাফিয়ে অপরদিকে নামলাম। আমাদের বাগান ও মহা-সড়কের মাঝে একটি কবরস্থান ছিলো। কবরস্থান বিভিন্ন বন্য হিংস্র পশু ও কীটপতঙ্গের দরুন ভীতির রাজ্য ছিলো। অসংখ্য ধসে যাওয়া কবর ও উঁচুনীচু মাটির স্তুপ দেখে ভয়ে কুনো ব্যাং হয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো। উপায় নেই। তবুও কৃত্রিম সাহস সঞ্চয় করে কবরস্থানে ঢুকে পড়লাম। মায়ের দেয়া সেই ছোট্ট হাদিয়াটুকু হাতে ছিলো। দু'চার কদম চলেছি। ইতোমধ্যে বাগানের দিক থেকে ভীতিপ্রদ এক বিকট

আওয়াজ এলো। দৌড়ে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি আম্মাজান বেহুশ অবস্থায় পড়ে আছেন। মাথায় পানি ঢাললাম। একটু পরে চোখ মেললেই আমাকে কাছে দেখে বললেনঃ বেটা! তুমি ফিরে এসেছো কেন? যাত্রা বিরতি করো না। আমাদের হিফাজত ঐ পরাক্রমশালী করবেন, যার প্রতি ইয়াক্বীন করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র সম্বল। অবশেষে বাগান থেকে পুনরায় বের হয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমালাম।

আযম হাশেমীর পারিবারিক পরিচিতি

আমি ঘর থেকে রাতের আঁধারে চুপিসারে কেন বেরিয়ে পড়লাম? কোথায় কোথায় ভ্রমণ করলাম? কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হলাম? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে আমি অতীতের দিকে মুখ ফিরাতে চাই।

ফারগানা (যা আজকাল উজবেকিস্তান)-এর জিলা আন্দরজানে একটি ছোট্টগ্রাম। কায়েকী নাম। এই গ্রামে ১৯১৫ সালে আমি জন্মগ্রহণ করি। পিতার নাম খোজা খান দামলা [১] দাদা হযরত শাইখ ইজ্জতুল্লাহ। আর নানা গিয়াসুদ্দীন ঈশান নিমনগানী। এঁরা সবাই নিজ নিজ সময়ের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। নানাজান তো গোটা তুর্কিস্তানে উস্তাযুল উলামা নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র, গুণগ্রাহী ও অনুসারী ছিলো। আমার পিতার উর্দ্ধতন চার পুরুষ পর্যন্ত বড় বড় আলিম ও নক্শবন্দিয়া সিলসিলার পীর ছিলেন। মাতার বংশ পরম্পরা হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হয়। আমার নানীর বংশের পূর্ব পুরুষগণ ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিত্ব কুতাইবা বিন মুসলিমের সাথে তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যে তুর্কিস্তানে আসেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। সে সময় থেকেই এই বংশে বড় বড় শাইখ ও উলামা জন্ম নেন। আমার হিজরতের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত যাঁদের মাযারসমূহ ছিলো।

রুশী যাররা যখন তুর্কিস্তানের উপর ধ্বংসাত্মক আগ্রাসন শুরু করলো, তখন নানাজান গিয়াসুদ্দীন ঈশান এবং আম্মাজানের মামা বাতূর তৌরাহ নিমনগানী এই আগ্রাসনের মোকাবেলাকারীদের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান হন। এই অপরাধের দরুণ তাঁরা নজরবন্দীর মধ্যে জীবনাতিপাত করেন এবং এ অবস্থাতেই ইহকাল ত্যাগ করেন।

---

১. সেখানে আলিমকে দামলা বলা হতো। হয়তোবা এটি ইংরেজী ও ফারসীর সংমিশ্রণে গঠিত। "দা" + "মোল্লা" = দামলা হয়েছে।

আর মোল্লা বা মোন্‌লা তুর্কী শব্দ। এর অর্থ আল্লামা – মহাজ্ঞানী। সারকথা, তুর্কীতে "মাওলানাকে" দামলা বলা হতো। –মেহেরবান।

আমার তিনজন মামা আবদুল হামীদ খান তৌরা, আবদুর রশীদ খান তৌরা এবং মুহীউদ্দীন খান তৌরা অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের দরবারে সর্বশ্রেণীর লোকের সমাগম ছিলো। উল্লেখ্য, "খান" শব্দটি তুর্কিস্তানে সাইয়েদ কিংবা বাদশাদের জন্য ব্যবহৃত হতো।

আমাদের পরিবার অনেক বড় ছিলো। এগারো ভাইবোন ছিলাম। পাঁচ ভাই দুই বোন আমার বড় ছিলো। আমাদের পরিবারের মেয়েরাও আরবী, ফারসী জানতো। আম্মাজান ও চার বোন বড় মাপের আলিম ছিলেন।

কৃষি ও ব্যবসা উভয়টাই আমাদের পেশা ছিলো। আনুমানিক সোয়া পাঁচশো বর্গ হাত আমাদের জমি ছিলো। কিছু জমিতে বাগান ছিলো। বাকীগুলোতে চাষাবাদ হতো। মোটামুটি সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাতাম। আর্থিক সংকট ছিলো না।

তুর্কিস্তানের আবাদী জমির ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হওয়া উচিত। জমির প্রকৃত মালিক সাধারণতঃ কৃষকরাই হতো। রাশিয়ার মতো জমিতে কৃষকরা শুধু কাজ করতো। আর জমি ও জমির উৎপাদিত সম্পদের মালিক হতো সরকার এমনটি নয়। হ্যাঁ বর্গা হিসাবে জমিহীনরা চাষাবাদ করতো। নিজস্ব জমি নেই এমন কৃষক খুব কম ছিলো। তবে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের মতো জমিদার ছিলো না।

আমার বাল্যজীবন অনেকটা বিপ্লবী ছিলো। আমাদের বংশের পুরুষরা প্রায় অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। আম্মাজান আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন। তার তত্ত্বাবধায়নে আমার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সম্পন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা নিমনগান, খোকন্দ, সমরকন্দ ও শহরে সব্জ এ চালু রাখি। লেখাপড়া সম্পূর্ণ গোপনে চলছিলো। তুর্কিস্তানের উপর স্যোশালিষ্টদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর দ্বীনি শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। দ্বীনের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসার করা অমার্জনীয় অপরাধ ছিলো। সুতরাং দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করার অর্থই ছিলো স্বয়ং নিজের উপর জুলুম-অত্যাচারকে দাওয়াত দেওয়া। তাই জালিমের জুলুম থেকে বাঁচার মানসে দ্বীনদার শ্রেণী গোপনে দ্বীনি শিক্ষাদান-অর্জনের কাজটি সেরে নিতো।

কমিউনিষ্ট শাসনামলে বুখারা-সমরকন্দের শিক্ষা-দীক্ষা

রুশী বিপ্লবের পূর্বে অত্র এলাকায় জেনারেল শিক্ষা নামে মাত্র ছিলো। প্রথমতঃ পাঠ্য মাধ্যম রুশী ভাষা ছিলো। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়-দায়িত্বে ক্যাথলিক পাদ্রীরা ছিলো। আর এরা নেহায়েতই চরমপন্থী ও সংকীর্ণমনা ছিলো। শিক্ষকতাও এরাই করতো। শিক্ষার প্রচার প্রসারের চেয়ে খ্রীষ্টবাদ প্রচারই তাদের মূল্য লক্ষ্য ছিলো। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা

শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ ধর্মহীন ও রুশীদের দালাল হতো। এজন্য মুসলমানরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বয়কট করেছিলো। জনসাধারণের দৃষ্টিতে এ ধরনের শিক্ষিতদের কোন ইজ্জত ছিলো না।

দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের অবস্থা

আর দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা! তুর্কিস্তানে অসংখ্য মাদরাসা ছিলো। পাঠ্য মাধ্যম তুর্কী ভাষা ছিলো। কোন শহর কিংবা কোন প্রত্যন্ত গ্রামও দ্বীনি শিক্ষালয় থেকে খালি ছিলো না। ধনিক শ্রেণীর লোকেরা উদার চিত্তে সেসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য অসংখ্য জমি ওয়াক্ফ করে রেখেছিলেন। ফ্রি শিক্ষাদান করা হতো। তবে কিতাবাদি ইত্যাদি ধার স্বরূপ দেয়া হতো। বারো-চৌদ্দ বছর ছাত্রদেরকে নিজ খরচেই লেখাপড়া করতে হতো। এসব দ্বীন মাদ্রাসা থেকে ফারিগ-শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কেউ কেউ রুশদের নিয়ন্ত্রিত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমানদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্বীনি মাসআলা-মাসায়িল প্রদানের দায়িত্বে তথা 'মুসলিম পার্সোনাল-ল কোর্ট'-এর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হতেন।

এসব প্রতিষ্ঠানের আলাদা জগত ছিলো। রাজনীতি এসবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ন্যায় মনে করা হতো। এ ময়দানটি লা-দ্বীন শক্তিগুলোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। তুর্কিস্তানী সমাজ ইসলামী বিশ্ব থেকে একেবারে বে-খবর ও অজ্ঞ ছিলো। বহিঃ বিশ্ব থেকে এরা অনেকটা কর্তিত ছিলো। সুখ–সাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতার হেতু পূর্ণ সমাজটাই যেন খরগোশসের ন্যায় বিভোর ঘুমে নিমজ্জিত ছিলো। প্রায় সবাই কবিত্ব ও কবিতাবৃত্তিতে মত্ত থাকতো। বছরে ৫/৬ মাস ভ্রমণ ও সফরে কাটাতো। সখে শিকার করা, নাম প্রচার-প্রসার ও সুখ্যাতির জন্য অবলীলায় টাকা-পয়সা খরচ করার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। উলামাদের সিংহভাগ সংকীর্ণতা ও নীচশয়তার শিকার ছিলেন। দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের দিকে মনোযোগের চাইতে মতোবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহে নিমজ্জিত থাকতেন। হ্যাঁ, তাসাউক এর পুরোদমে চর্চা ছিলো। তবে বিরাট একটি শ্রেণী কউমের সামাজিক বিষয়াদি থেকে একেবারে বিমুখ হয়ে স্রেফ খানকাসমূহে পড়ে থাকতেন। এই শ্রেণী সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অপরাপর উন্নতি ও অগ্রগতিকে একেবারেই উপেক্ষা করে চলতেন। সাথে সাথে তাঁদের অনুসারী ও মুরীদদেরকেও এই দীক্ষায় দীক্ষিত করতেন। তাঁদের এ জড়তার প্রতি কেউ প্রশ্ন উঠালে তারা পাল্টা জবাবে বলতেন ঃ কে এমন আছে যে, আমাদের উপর চড়াও হবে? যদি খোদা নাখাস্তা এমন কোন মুহূর্ত এসে যায়, তাহলে আমরা জিহাদের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো। বরং এ খানকাগুলোর প্রকৃত দীক্ষাই হলো জিহাদের তৈরী নেয়া। এই ছিলো তুর্কিস্তানের মুসলমানদের হাল-হাকীকত।

রাশিয়ায় বিপ্লবের ঢেউ

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিপ্লব আসে। যারশাহীর তখ্ত্ উল্টে যাওয়ার পর গণতন্ত্রপ্রিয় জাতীয়তাবাদী রাশিয়ানরা আলেকজান্ডার কারেন্সকী'র নেতৃত্বে অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এদিকে তুর্কীস্থানও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেয়। খোকন্দ সেই নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিলো। কারেন্সকী সরকার তুর্কীদের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু তৃর্কীদের কাছে কোন সৈন্য বাহিনী ছিলো না। মিলিশিয়া নামে (ন্যাশনাল গার্ড) সীমিত পুলিশ বাহিনী ছিলো। তবুও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রটির নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতাকে মজবুত করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। উলামাগণও তাদের প্রতি পরিপূর্ণ সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেন। নীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হলো। নীতি-নির্ধারণের কাজও খুব দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো। ইতোমধ্যে কমিউনিষ্টরা লেনিনের নেতৃত্বে কারেন্স্কী সরকারকে উৎখাত করলো। ১৯১৮ ফেব্রুয়ারীতে স্যোশালিস্টরা তুর্কিস্তানের উপর চড়াও হলো। দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে তুর্কীদের নব্য স্বাধীনতাকে গিলে ফেললো। ১৯২১ সালে ডিসেম্বরে তারা বুখারা ও খেওয়া রাষ্ট্র দখল করলো।

কমিউনিষ্টরা তুর্কিস্তানের উপর কব্জা করার সাথে সাথে জমি, বাগ-বাগিচা তথা স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু জবর দখল করে নিলো। কৃষক, ব্যবসায়ী, উলামা, ও দ্বীনদার শ্রেণী চাই শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত হোক সবাইকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হলো। রোযা রাখা অমাজর্নীয় অপরাধ সাব্যস্ত করা হলো। হজ্জের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। মসজিদসমূহ বন্ধ করে দেয়া হলো। মোটকথা, ইসলাম ও মুসলমানের কোন চিহ্নই না রাখার পরিকল্পনায় তারা মাঠে অবতীর্ণ হলো।

যেভাবে মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করা হলো

মসজিদ-মাদরাসাসমূহকে বন্ধ করার জন্য তারা এক বিরাট কুট-কৌশল অবলম্বন করলো। সর্বপ্রথম মসজিদ-মাদ্রাসার ওয়াক্ফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করলো। এভাবে মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়লো। অতঃপর তারা মসজিদের উপরও ট্যাক্স ধার্য করলো। যখন লোকজন চাদা তুলে ট্যাক্স আদায় করতে লাগলো, তখন চাদা দানকারীদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হলো। প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া শুরু হলো যে, যেসব লোক মসজিদের ট্যাক্স আদায় করে, তারা সরকারী খাজনা চুরি করে মাল সঞ্চয় করছে। অন্যথায় তারা

মসজিদের ট্যাক্স আদায় করার এতো টাকা কোথায় পায়? আমরা সেই সম্পদের তন্ন তন্ন তল্লাশি চালাবো, তারপর দেখবো কারা মসজিদের ট্যাক্স আদায়ের বাহাদুরী দেখায়!

এদিকে মসজিদের ট্যাক্স যথাসময়ে আদায় না করতে পারলে তা চক্রহারে বৃদ্ধি পেতে থাকতো, যাতে মসজিদ পরিচালনা কমিটি মহা সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়তেন। অপরদিকে এক পর্যায়ে নামাযীদের উপরও ট্যাক্স ধার্য করা হলো। পরিনতিতে পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, লোকজন ঘরে নামায পড়তে শুরু করলো। আর মসজিদগুলো বিরান হতে লাগলো। কমিউনিষ্টরা বাহানা পেলো যে, মসজিদে কেউ নামায পড়ছেনা। তাই হঠাৎ একদিন ওরা জমায়েত হয়ে ঘোষণা দিতো যে, মসজিদটি বেকার পড়ে আছে; কেউ এতে এখন আর নামায পড়ছেনা। সে জন্য সরকার এটাকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। ব্যাস, যেমন কথা, তেমন কাজ। দ্বিতীয়দিনই সরকারী লোকজন মসজিদ দখল করে নিতো। অতঃপর সেটাকে শহীদ করে দিতো অথবা সেটাকে ক্লাব, আস্তাবল কিংবা খেলাঘর বানাতো।

কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক কার্যক্রম

ছলে-বলে কলে কৌশলে স্যোশালিষ্টরা রাশিয়া ও তুর্কিস্তান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করার কাজে আদাপানি খেয়ে মাঠে অবতীর্ণ হলো। গ্রাম-গঞ্জের আনাচে-কানাচে কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা অফিস খোলা হলো। এক সময় তারা একটি বিরাট চাল চাললো। তারা সর্বস্তরের মানুষের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করলো। ফলে কৃষক, শিল্পপতি, চাকুরীজীবি ব্যবসায়ী এমনকি দ্বীন-মজুরেরও লাইসেন্স ছাড়া কাজ করার অনুমতি রইলো না। ধার্মিক ও সমাজপতি শ্রেণীর লোকদের লাইসেন্স পাওয়া এক রকম মুশকিলই ছিলো। লাইসেন্স নিতে হলে দ্বীন ও ইসলামের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা দিতে হতো। অপরদিকে বদমাআশ ও সন্ত্রাসীদেরকে দ্বীনদার শ্রেণীর পিছে লেলিয়ে দেয়া হলো। সন্ত্রাসীরা সমাজের নামাযী, রোযাদার ও প্রসিদ্ধ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গকে প্রকাশ্যে-গোপনে নৃশংসভাবে হত্যা করে চললো। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করেও সন্ত্রাসী বুক ফুলিয়ে জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াতো। এভাবে অসংখ্য মুসলমান শহীদ করা হলো।

চরম দুর্দিনের মুখোমুখি মুসলমান

১৯২৭ সালের পরে হত্যা, গুম, ইসলাম দুশমনী মার্তাতিরিক্ত বেড়ে যায়। কমিউনিষ্টরা ইসলামের উপর বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ লাগতে লাগলো। কুরআন, হাদীস, ধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গ, হাসি মজাকপূর্ণ কার্টুন তৈরী

করে পথে-ঘাটে ও মসজিদে লাগিয়ে দিলো। নবী আকরাম (সাঃ)-এর পূত-পবিত্র চরিত্র নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হলো। সিনেমা-থিয়েটারে ধৃষ্টতাপূর্ণ ছবি দেখানোর পরিকল্পিত ব্যবস্থা করা হলো এবং তা দেখা বাধ্যতামূলক করা হলো। এক পর্যায়ে নবী কারীম (সাঃ)-এর কাল্পনিক মুর্তি বানিয়ে চৌরাস্তাগুলোতে স্থাপন করা হলো। আর প্রত্যেক পথচারীকে সেই কাল্পনিক মুর্তিটি জোরপূর্বক দেখানো হতো। মোটকথা, মুসলমানরা এমন একটি কঠিন দুর্দিনের মুখোমুখি হয়েছিলো যে, হিজরত অথবা জিহাদ করা ছাড়া তৃতীয় কোন রাস্তা ছিলো না।

হৃদয় কাঁপানো একটি জলসা

একদিনের ঘটনা। আমাদের গ্রামের বড় মসজিদে কমিউনিষ্টরা একটি জলসার আয়োজন করলো। সারা এলাকায় ঘোষণা করা হলো যে, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে অত্র জলসায় উপস্থিত হতে হবে। অনুপস্থিত লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

ঘোষণার পর সর্বস্তরের লোক মসজিদে জমায়েত হলো। লোকে লোকারণ্য। তিল পরিমাণ স্থানও মসজিদে খালি নেই। জলসা যথারীতি শুরু হলো। সভাপতি প্রথমেই এই ঘোষণা করলো যে, রূহানী (আলিম-উলামা) লোকেরা চলে যান। প্রসংগত উলেখ্য যে, যেসব লোক নিষ্ঠাবান-দ্বীনদার ধার্মিক কিংবা আলিম, তাদেরকে তৎকালীন তুর্কিস্থানে রূহানী বলা হতো। যা হোক, এই ঘোষণার পর অনেক লোক উঠে চলে গেলেন। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে আওয়ারা, উশৃঙ্খল ও বদমাআশ প্রকৃতির লোকই বেশী ছিলো। আর বাকিরা ছিলো মুর্খ ও কমজুর ঈমানদার কিসিমের।

যারা চলে গেছেন, তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো। কিছুক্ষণ একেবারেই নীরবতা বিস্তার করলো। এরপর বিকট শব্দে ঘন্টা বাজানো হলো। মনে করবেন, মসজিদে গীর্জা ঘরের মতো ঘন্টা বাজানো হলো? জী-হ্যাঁ! মসজিদে ঠিক খ্রীস্টানী কায়দায় ঘন্টা বাজানো হলো। এমনিতেই পরিস্থিতি নিতান্ত থমথমে ছিলো। ঘন্টা বাজানোর পর লোকজনের ভয়-ভীতিতে বর্ধন হলো।

ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি মঞ্চে আর্ভিভূত হলেন। ঘোষণা করা হলো, ইনি মুসলিম দার্শনিক। এক ঘন্টা পর্যন্ত তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষোদগার করলেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করার উর্ধ্বে। তার বক্তৃতার সারকথা এই ছিলো যে, সকল ধর্ম, বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক যেসব ধর্মীয় বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার প্রচার-প্রসার করা হয়েছে, এর দ্বারা শ্রেফ আপামর জন সাধারণের সম্পদ লুটপাট করে ভোগ করা ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য

নেই। এর দ্বারা নিরেট ধর্ম ব্যবসা ছাড়া কোন লক্ষ্য নেই। ধর্মের বিধানাবলীর নামে গদবাধা কিছু নিয়মনীতি নিজেদের উদরপুর্তির জন্য সমাজপতি আর মোল্লারা তৈরী করেছে। আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) আখিরাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-দোযখ, ফিরিশতা ও জান্নাত ইত্যাদি এসবই জুজু বুড়ির গল্পের ন্যায় রূপকথা ছাড়া কিছু নয়। মোটকথা, এসব কিছু রূহানী (উলামা-মাশায়িখ) নামের এক শ্রেণীর বিবেকের ফসল। কমিউনিষ্ট পার্টি এসব কিছুকে সমূলে মুলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। পার্টি মেহনতি মানুষকে সব ধরনের ধর্মের জাল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

বক্তা সাহেব দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিলো ঃ কেউ আছে এখানে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে?"

এ চরম ধৃষ্টতা দেখে মন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। চোখ দুটো রক্ত অশ্রু বহাচ্ছিল। মনে হচ্ছিলো, লাখো উলামা-মাশায়িখের শতশত বছরের এই নীলাভূমিতে ইসলামের সাথে এই অসদাচরণ? দাঁড়িয়ে গেলাম এবং কমিউনিষ্টদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দীপ্তকণ্ঠে বললাম; "যারা তোমাদের এসব অপলাপের জবাব দিতে পারে, তাদেরকে তো তোমরা প্রথমেই মজলিস থেকে বের করে দিয়েছো। এখানে তোমরা কার কাছে জবাব চাও? এ বুদ্ধু বখ্শ্রা কি তোমাদের জবাব দিতে পারবে?" জোশের সাথে যা বলার তা বলে দিলাম। মসজিদে একেবারেই নীরবতা বিরাজ করছিলো। একটি সুই ফেললেও যেন তার আওয়াজ শোনা যাবে। তাই এ চরম নীরবতার মধ্যে আমার কথাগুলো সজোরে প্রতিধ্বনিত হলো। আমার কথা বলা শেষ হওয়া মাত্রই চারিদিক থেকে ধর, ধর, ধর এর আওয়াজ শোনা গেলো। যেমন কথা তেমন কাজ, চতুর্দিক থেকে কমিউনিষ্টরা মৌমাছির মতো ঘিরে ফেললো। কিল্, ঘুসি, লাথি, চর-থাপ্পর, যে যা পারলো মারলো। পরনের কোটটা ফেটে গেলো। কাপড়-চোপড় সব ছিড়ে-ফিরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে পুলিশরা বুটের লাথি মারতে মারতে মসজিদের বাইরে ফেলে দিলো।

আযম হাশেমী ঘরে ফিরলেন

অনেকক্ষণ প্রায় সম্বিত হারা অবস্থায় পড়ে থাকার পর হেচরাতে হেচরাতে ঘরে ফিরলাম। আমার এ দুরবস্থা দেখে ছোট ভাইবোন ও আম্মাজান খুবই বিচলিত হলেন। বিশেষত: আম্মাজান এতো পেরেশান হলেন যে, যা বর্ণনাতীত। আর তার এতো বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিলো। কারণ ধর্ম ও ধার্মিক শ্রেণীর উপর এ অকথ্য নির্যাতন সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। খোদ আমাদের খান্দান তাদের কোপানলের শিকার ছিলো। প্রতি নিয়ত আমাদের

বংশের লোকেরা আতংকগ্রস্ত ছিলো। স্যোশালিষ্ট পুলিশরা আমার চাচাজান, দু'জুন মামাজান, একজন ভগ্নিপতি, দু'জন খালাতো ভাই এবং বেশকজন অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ধর্মীয় মুরুব্বী হওয়ার অপরাধে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেছে। আজ নাগাদ তাদের কোন সংবাদ মেলেনি। তাদেরকে জমীনে গিলে ফেলেছে নাকি আসমানে ছো মেরে নিয়ে গেছে, সে কথা আমাদের কেউ জানেনা।

আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলেন বাছা! তোমার সাথে এরূপ অসদ্ব্যবহার কে করেছে? আমি বলতে চাইলাম না। কিন্তু আম্মাজান খুবই জোর-জবরদস্তি করছিলেন বিষয়টি জানার জন্য। অবশেষে ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করলাম। আম্মাজান শুনছিলেন আর কাঁদছিলেন। সবশুনে বললেন বেটা! এরা জাহিল, বে-দ্বীন! দুঃখজনক যে তাদের হাতে আজ ক্ষমতা। এই নরপিশাচদের গায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাওয়া পর্যন্ত লাগেনি। তাদের অপলাপ সব মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

ঠিক আছে; তবে তোমার ব্যাপারে আমি খুবই চিন্তিত। তোমার নিরাপত্তার কোন একটা ব্যবস্থা আমাকে নিতেই হবে। অন্যথায় তাদের কোপানল থেকে তোমাকে রক্ষা করা কিছুটা দুস্কর হবে।

মনটা এতো অস্থির ও বে-কারার ছিলো যে কোন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিলো না। আম্মাজান জোরপূর্বক নিজ হাতে কয়েক গ্রাস খাইয়ে দিলেন। রাত বেশ গভীর হয়েছিলো। আম্মাজান ও দু'বোন আমার পিছে ইশার নামায পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। একটি কিতাব দিয়ে বললেনঃ "এটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।" আমি কিতাবটি খুলে দেখলাম, সিরাতুন্নবী-এর প্রথম খণ্ড। কাযান শহরে এটি ছাপা হয়েছিলো। সারা রাত এটি পড়লাম। শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণ আরাম করলাম। নামাযের সময় আম্মাজান ডাকলেন। সবাই একসাথে জামা'আত করে ফযরের নামায আদায় করলাম।

আযম হাশেমীর মাতা নাগরিকত্ব হারালেন

ছোট দু'ভাই মাদ্‌রাসায় চলে গেলো। দুপুরের দিকে ওরা এসে আম্মাজানকে কি যেন বললো। তারপর আম্মাজান বললেনঃ এসব লোক দ্বীনের দুশমন। আর দ্বীনের দুশমনরা দ্বীনদার লোকদেরকে নিয়ে অনর্থক বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।

পরে শুনলাম মাদ্‌রাসায় ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি ধর্মবিরোধী আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর প্রত্যেক ছাত্রের মাতা-পিতার সে ব্যাপারে মতামত জানতে চাওয়া হয়। আর এর উপর ভিত্তি করে পনের দিন পর আম্মাজানের নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়। তাঁর নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নেয়ার মূল কারণ ছিলো আম্মাজান আলিমা ছিলেন। এ মুহূর্তে আম্মাজান বললেনঃ অমাদের ঈমানী

পরীক্ষার সময় এসেছে। এসব লোকের থেকে এ ধরনের দুর্ব্যবহারেরই আশংকা ছিলো। এই বদমাআশ শ্রেণী এই ভূ-খণ্ডে ধর্মীয় জ্ঞানী কিংবা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তির অস্তিত্বকে সহ্য করবেনা। ছলে-বলে কলে-কৌশলে এরা এঁদেরকে জুলুমের লক্ষ্যবস্তু বানাবে। তিলে-তিলে এরা দ্বীনদার শ্রেণীকে মূলে-শিকড়ে উপড়ে ফেলবে।

হিজরতের উদ্দেশ্যে গোপন পরামর্শ

আম্মাজান আমাকে একদিকে নিয়ে গেলেন। তারপর অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরুত্ব সহকারে বললেনঃ "বেটা! পরিস্থিতি দিন দিন ঘোলাটে হচ্ছে। এই মুহূর্তে কোন কিছু বলা খুব মুশকিল। বলা যায়না দুশমনেরা কবে আমাকে শহীদ করে দেয় কিংবা দেশান্তর করে দেয়। এ ভূ-খণ্ডে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমি তোমাকে হিজরত করার অনুমতি দিচ্ছি। অন্য কোন দেশে চলে যাও, যাতে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে পারো।"

আজকাল আমাদের অধিকাংশ সময় সলা-পরামর্শের মধ্যেই কেটে যায়। দুঃসময়ে কতো দুঃশ্চিন্তা আসে, তা ভুক্তভোগী লোকই বলতে পারবে। উত্তরাধিকার সূত্রে আব্বাজান, দাদাজান ও নানাজানের অনেক মুল্যবান কিতাব পেয়েছিলাম। মেহমানখানার দেওয়াল খুব মোটা ছিলো। একদিন মা-ছেলে পরামর্শ করে আনুমানিক ছয় ফুট গর্ত করে দীর্ঘকায় গর্ত খুড়লাম। তারপর সেই গর্তে কিতাবগুলো রেখে প্লাষ্টার করে দিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, স্যোশালিষ্টরা অচিরেই এই ইমারত দখল করে নিবে এবং এটিকে ধ্বংস না করে কোন সরকারী কাজে ব্যবহার করবে। যেমনটি তারা বিভিন্ন স্থানে করেছে।

আম্মাজানের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঠিক তেইশ দিনের মাথায় হিজরতের পথে পা বাড়াই।

খাজিরাবাদের প্রতিকুল পরিস্থিতি

একাধারে কয়েক ঘন্টা চলার পর খাজিরাবাদের নিকটে পৌঁছলাম। খাজিরাবাদ আমাদের গ্রাম থেকে চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের কোল ঘেসে রেল লাইন। গ্রামে ঢুকতে ঐতিহাসিক সাইহুন দরিয়া পার হতে হয়। নিকটে পৌঁছে দেখলাম রুশী ফৌজ গ্রামটি ঘেরাও করেছে। আনুমানিক দেড় হাজার ফৌজ হবে। পরে শুনলাম যে, খাজিরাবাদেও কমিউনিষ্টরা ইসলাম বিরোধী জলসা করেছিলো। মুসলমানরা সবাই মিলে ওদের বোতল নিংড়ায়ে দিয়েছে। রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে। বিদ্রোহিতার পতাকা উড়িয়েছে। আম-জনতার পাল্টা এ্যাকশনের পুনর্জবাব হিসাবে ফৌজ এসেছিলো। খুব কড়া পাহারা ছিলো। স্থানে স্থানে রাইফেল তাক করে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে

ছিলো। কারুরই তাদের চোখ এড়িয়ে পালানোর জো ছিলো না। অত্যন্ত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম। কথায় বলে, একে তো কাটা ঘা, তার উপর ফের লবনের ছিটা। ফিরেও যেতে পারিনা; পালাতেও পারি না। এমনকি লুকানোরও কোন জায়গা দেখিনা। এই প্রথম মৃত্যুকে মাথার উপর দণ্ডায়মান দেখলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মনের অজান্তেই ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সাল মুখে জারি হয়ে গেলা। সাথে সাথে এক ধরনের অচেতনতা আমাকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু আমি হেটে চলছি। কিছুক্ষণ পর যখন বোধশক্তি ফিরে পেলাম, তখন দেখি ফৌজি অনেক দূরে রেখে চলে এসেছি। বাস্তবিকই এটা একটা আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা ছিলো। আজো আমি সেটা বুঝে উঠতে পারি না।

উঁচি শহরে আগমন

যাহোক সেদিন সন্ধাতেই উঁচি শহরে পৌঁছলাম। এ শহরে মরহুম আব্বাজানের একজন সহপাঠী ছিলো। ইলমে- আমলে অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। স্যোশালিজমের থাবা থেকে এ শহরটিও বাঁচতে পারেনি। আর তাদের থাবার প্রথম শিকার হয় মরহুম পিতার এই বন্ধু। লোকেরা বললো, আল্লাহর সেই সেনাটিকে জালিমরা গত রাতে শহীদ করে দিয়েছে। এলাকাবাসী আমাকে নিমনগানের পথ ধরিয়ে দিলো। পরের দিন এই নিমনগানে পৌঁছলাম। এই শহরে আমার নানার বাড়ী। এখানে কিছুক্ষণ থাকলাম। এরপর ট্রেনে খোকন্দে পৌঁছলাম।

বাহাদুর খোকন্দবাসী

খোকন্দ তুর্কিস্থানের ঐতিহাসিক শহর। বেশ প্রশস্ত ও বড়। যারশাহীর পতনের পর যে কদিন স্বাধীন একটি রাষ্ট্র কায়িম ছিলো, সেই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিলো এই খোকন্দ শহর। আমাদের গ্রাম থেকে একশো বায়ান্ন মাইল দূরে অবস্থিত। খোকন্দে কমিউনিষ্টদের জুলুম নির্যাতন চরমে ছিলো। মুসলমানরা তাদের অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেয়। যখন কোন কমিউনিষ্ট ইসলাম, আল্লাহ, রাসূল তথা ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতো, তখন তার প্রতিকারে এই আণ্ডার গ্রাউণ্ডের আন্দোলনের সদস্যরা রাতের আঁধারে তার কাজ সম্পাদন করে মাথাটি ও একটি চরম পত্র পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছে দিতো। এতে এ ধরনের কথা থাকতো ঃ "তোমরা দ্বীনের খেলাফ মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ লাগাও এবং উলামায়ে কিরামকে তার জবাব দিতে দাও না। আমাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে

ইসলাম সম্পর্কে কু-ধারণা ছড়াও। তাই এখন আমরা তোমাদের এসব প্রোপাগাণ্ডার জবাব এভাবে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি।"

মুসলমানদের এই জবাবী আন্দোলনের দরুণ কমিউনিষ্টদের মধ্যে ভীষণ ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো। কোন কমিউনিষ্টই স্বীয় জীবন নিরাপদ মনে করতো না। রাত হওয়া মাত্র সবাই নিজ নিজ ঘরে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শুয়ে পড়তো। কে জানে, সকাল বেলা জীবিত উঠবে না মৃত .....। এক পর্যায়ে মসজিদসমূহে ও বাজারগুলোতে এই এ'লান করা হলো" কাউকেও জোরপূর্বক কমিউনিষ্ট বানানো হবে না। যার ইচ্ছে সে কমিউনিষ্ট পার্টি করবে, যার ইচ্ছে করবে না, সেটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার থাকবে। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেয়া হচ্ছে যে, রূহানীদের জন্যও রেশনকার্ড বরাদ্দ করা হবে।"

যদিও এই ঘোষণা কমিউনিষ্টদের একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছিলো। এতদসত্ত্বেও আমার মতো সাদাসিধে অসংখ্য লোক এই ঘোষণার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো। তাই আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে থেকে ইল্‌ম শিখবো।

আযম হাশেমী খোকন্দে থেমে গেলেন

শাইখ মুহাম্মাদ জান ওরফে বানি দামলা– খোকন্দের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। আমার নানার ছাত্র এবং পিতার সহপাঠী ছিলেন। কমিউনিষ্টরা তাঁকে নিজ ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছিলো। এই ঘোষণার পর আমি তার দরবারে হাজির হলাম। পরিচয় দেয়ার পর বললামঃ "আমি এখানে থেকে দ্বীনি ইল্‌ম শিখতে চাচ্ছি।"

শাইখ বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন ঃ "বেটা! দ্বীনি শিক্ষাদান-গ্রহন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তবে একটি পদ্ধতি আছে, তাহলো তুমি দিনের বেলা কিছুক্ষণ মজদুরী করো। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে আমার কাছে আসা-যাওয়া করো। এভাবে আমার সংশ্রবে থাকার একটি ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

আমি শাইখের এই পরামর্শ মেনে নিয়ে দিন-মজুরী শুরু করলাম। দিনভর হাড়ভাংগা কাজ করার পরও অধির আগ্রহে রাতের বেলা শাইখের কাছে ইল্‌মে দ্বীনের পিপাসা নিবারণ করে চললাম। শাইখ মুহাম্মাদ জান দামলা কমিউনিজমের কুফরী মতবাদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। পাঠদানের সময় সেসব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করতেন। সাথে কমিউনিজমের ক্ষতি ও ভয়াবহতার কথাও উল্লেখ করতেন। মাঝে মাঝে তাদের পক্ষ থেকে উত্থিত অভিযোগ সমূহের এমন প্রামাণিক জবাব দিতেন, যা শুনে একেবারে হতভম্ব হয়ে যেতাম।

পরিস্থিতি আবারো ঘোলাটে

আমার খোকন্দ আসার তৃতীয় মাস অতিক্রান্ত হচ্ছিলো, কমিউনিষ্টদের পুরানো থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়লো। ওদের বিভৎস চেহারা আবার খিলখিল করে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো। চালু হলো নিরীহ মুসলমানের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। সরকারীভাবে উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীর ফিরিস্তি তৈরী করা হলো। ইসলাম-প্রিয় এবং প্রকৃত দেশ-প্রেমিকদের পিছে কড়া গার্ড দেয়া হলো। "আওয়ামী পুলিশ" গ্রুপে শহরের বখাটে ও গুণ্ডা শ্রেণীর ছোকড়াদের ভর্তি করা হলো। ওদের মাধ্যমে দ্বীনদার, ধার্মিক ও দেশ-প্রেমিক শ্রেণীকে হুমকি-ধমকি দেয়া শুরু হলো। এক পর্যায়ে তাদের উপর হামলা করা হলো; মিথ্যা মামলা দেয়া হলো। অনেককে গ্রেফতার করে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করতঃ মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হলো।

রোজ সত্তর/আশিজন মানুষ গুম হয়ে যেতো। আর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের কোন হদীস পাওয়া যেতো না। আমি খোকন্দের বেশ ক'জন গণ্যমান্য আলিমের খিদমাতে হাজির হলাম। এই নাজুক ও সঙ্গীন পরিস্থিতি তাদের সামনে তুলে ধরলাম। কিন্তু পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, লোকজন নিরাশ ও অসহায় হয়ে পড়েছে। অধিকাংশের জবাব এটাই ছিলো যে, "বেটা! আমরা তো এখন মৃত্যু এবং শাহাদাতের প্রহর গুনছি।"

এ মুহূর্তে কমিউনিষ্টরা একেবারে লাগামহীন হয়ে গেছে। তিন মাস আগে তারা যে ঘোষণা দিয়েছিলো, সেটা একটি চাল ছিলো। কিন্তু এখন আর সেই চাল চালবারও প্রয়োজন নেই। আম জনতাকে লিডারশিপ থেকে একেবারেই বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে। তাই সতর্কতারও প্রয়োজন নেই। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে। মোকাবেলার শক্তি কারো নেই। কারো জানমালের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছেনা। চারিদিকে যেন ত্রাসের রাজ্য কায়িম হয়েছে।

আমার কাছে একটি হামায়েল শরীফ (কুরআন মাজীদ) ছিলো। এর কয়েকটি পৃষ্ঠা খুলে গিয়েছিলো। তাই এটিকে একটি বাইণ্ডারের দোকানে নিয়ে গেলাম। দোকানটি টুপিবাজারে ছিলো। খোকন্দের জামে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে এ বাজারটি অবস্থিত। বাইণ্ডার কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা ঠিক করছিলো। ইতোমধ্যে একজন কমিউনিষ্ট এসে বললোঃ

আমার কিতাবগুলোর কাজ কি হয়েছে?

বাইণ্ডার বললো ঃ এক ঘন্টার কাজ বাকি আছে। এ কাজটি শেষ করে আমি কিতাবগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো।

কমিউনিষ্ট বললো ঃ তোমার হাতে এটি কি?

বাইণ্ডার ঘাবরাতে ঘাবরাতে বললো ঃ এটি! এটি!........। এটি কুরআন শরীফ। দু'চার মিনিটের কাজ। এটি সেরে এক্ষুণি আপনার কাজ ধরছি।

কমিউনিষ্ট তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। পরক্ষণেই বাইণ্ডারের হাত থেকে ঝাপটি মেরে কুরআন শরীফটি নিয়ে অকথ্য গালি-গালাজ করতে থাকলো এবং সজোরে সেটিকে সড়কে নিক্ষেপ করলো। নাউজুবিল্লাহ।

আহ! আমার খোদার কালামের সাথে এই আচরণ! আমার রক্ত টগবগ করে উঠলো। কিন্তু ব্যর্থতা সাথে সাথে দু'হাত ধরে ফেললো। আর বললো, তোরা তো পরাজিত হয়ে গেছিস। এই ঐতিহ্যবাহী মুসলিম অধ্যুষিত পবিত্রভূমিতে এতোটুকু তো এই মুহূর্তে মেনে নিতে হবে। তাই সাথে সাথে রক্তের ঢোক গিলে ক্ষান্ত হলাম। আর অপরাগের মতো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম। চুপচাপ গিয়ে কুরআন শরীফটি উঠালাম এবং বার বার চুমু খেতে থাকলাম। মনের মধে বার বার এ খেয়াল আসছিলো– আমরা মুসলমানদের শক্তি সামর্থ ও ঈমান এতোটুকু দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, দুশমন জনসমক্ষে আল্লাহর দ্বীনের সাথে ধৃষ্টতা করছে, কিন্তু তার প্রতিকারের শক্তি পাচ্ছি না। ইতোমধ্যে সেই বদমাআশ নিজ কাজ শেষ করে রওয়ানা হলো। আমি তড়িঘড়ি বাইণ্ডারের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিয়ে লোকটির পিছু নিলাম। কিছু দূরেই থানা ছিলো। যেই লোকটি থানার কাছে এলো, সেই তার হাত ধরে থানায় নিয়ে গেলাম। থানা কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ দিলাম। দোষীর যথোচিত বিচার প্রার্থনা করলাম। আমি কর্তৃপক্ষকে বললামঃ

"এ লোকটি রাষ্ট্রের স্পষ্ট বিধান লংঘন করেছে। রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলো যে, কোন কমিউনিষ্ট দ্বীনের খেলাফ আপত্তিকর কোন কাজ করবে না। কাউকেও জবরদস্তি কমিউনিষ্ট বানানো হবে না। সুতরাং এ লোকটির শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

থানা কর্তৃপক্ষ আমার অভিযোগের প্রতি আদৌ কর্ণপাত করলো না। বরং উল্টো আমাকে ধমক দিতে লাগলো এবং বললো; "আমাদের কাছে কেন এসেছো? তোমাদের খোদার কাছে যাও, যার নামে তোমরা বাঁচো মরো।"

খোকন্দ মসজিদের আশেপাশে কিছুদিন

থানা থেকে বের হয়ে জামে মসজিদে পৌঁছলাম। এ মসজিদটি আজো রয়েছে। আজকাল সেটাকে যাদুঘর বানানো হয়েছে। সে সময় এটি শহরের মধ্যস্থলে ছিলো। উজুখানা, হুজরা ইত্যাদি সব নিয়ে আঠারো একরে বিস্তৃত ছিলো। খুবই সুদর্শন মসজিদ। স্তম্ভগুলোতে সুনিপুণ কারুকার্য ছিলো। মসজিদের

পাশ দিয়ে উত্তর দিকে বড় রাস্তা ছিলো। রাস্তার পাশে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত অসংখ্য দোকান। মসজিদের পূর্বপার্শে বিরাট শাহী হাম্মামখানা ছিলো, খোদ খোকন্দের আমীর অথবা স্থানীয় সবচে বড় আলিম নামায পড়াতেন। শেষের দিকে শাইখুল ইসলাম তৌরা খান দামলা ইমাম ছিলেন। সপ্তাহে একদিন তিনি ওয়াজ করতেন। কমিউনিষ্টরা তখন পর্যন্ত ওতে হাত দেয়নি। তবে সুযোগের তালাশে ছিলো। আর মসজিদটির বিরুদ্ধে জনসমর্থন জোগাড় করছিলো। একজন লোককে শাইখুল ইসলাম তৌরা খান দামলার পিছে লাগিয়ে রেখেছিলো। সে শাইখের পিছু পিছু সার্বক্ষণিক কড়া দৃষ্টি রাখতো। তাঁর কাছে আগন্তুকদের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। গোয়েন্দা লোকটি আফগানী ছিলো। খুবই খোশ-মেজাজ ও রসিক। দেখতে নিতান্তই খোদাভীরু মনে হতো। দীর্ঘকায় দাড়ি ও সুঠাম দেহ, কপাল প্রশস্ত। কখনও তার জামাআত ক্বাজা হতো না। ফজরের নামাযে সর্বাগ্রে আসতো। স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াতো। দীর্ঘ সূরা দিয়ে সুন্নাত নামায আদায় করতো। এরই ফাঁকে আগমন-প্রত্যাগমনকারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখতো। মসজিদে আফগানী পোষাক পরতো, আর বাইরে স্থানীয় পোষাক পরিধান করতো।

লোকটির চাল-চলনে আমার সন্দেহ হলো। তাই শিকড় সন্ধানে নামলাম। এক পর্যায়ে জানতে পারলাম যে, লোকটি শাইখুল ইসলাম তৌরা খান দামলার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগীরিতে লিপ্ত। সাথে সাথে তাঁর কাছে আগমনকারী ও আফগানিস্তানে হিযরতকারীদের ফোঁক-ফাঁকর তালাশ করে।

আমি আসপারাগোরজীতে চলে গেলাম। এটি খোকন্দের একটি মহল্লার নাম। এ মহল্লায় একটি বড় মসজিদ আছে। মসজিদের অসংখ্য সুদর্শন কামরাও রয়েছে। আমি একটি কামরা থাকার জন্য পেয়ে গেলাম। একদিন জুমুআর নামাযের পর কিছু লোক তৌরা খান দামলার মাদরাসায় এলো। আমিও তাদের সাথে এলাম। সেই আফগানী গোয়েন্দা লোকটিও সেখানে উপস্থিত ছিলো। তৌরা খান দামলা যখন জানলেন যে, আমি তাঁর উস্তাদ হযরত গিয়াসুদ্দীন ঈশানের নাতি এবং তার সহপাঠী খোজা খানের ছেলে, তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাড়ির খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর নিমনগানের কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলিমের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যখন আমি বললাম যে, তাদের সবাইকে কমিউনিষ্টরা শহীদ করে দিয়েছে, তখন পুরো মজলিসে নীরবতা ছেয়ে গেলো।

শাইখের কাছে চলে যাওয়ার ইজাজত চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কোথায় থাকো? বললামঃ মাদ্‌রাসায় মীর আলম-এর এক কামরায় থাকি। আফগানী গোয়েন্দার কারণে সঠিক ঠিকানা বললাম না। মাদ্‌রাসা মীর আলম

ইসলামী শাসনামলে বিরাট ইসলামী শিক্ষাপীঠ ছিলো। হাজার হাজার ছাত্র এখানে পড়তো। সকল ছাত্র-উস্তাদের জন্য অসংখ্য আবাসিক হল ছিলো। আজকাল সেই মাদ্‌রাসা স্যোশালিষ্টদের দখলে। রুশী মজদুর ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসাফিররা এখানে থাকে।

তৌরা খান দামলা অধিকাংশ সময় আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে আপ্যায়ন করতেন। একদিন সেই আফগানী জোরপূর্বক তার কামরায় নিয়ে গেলো। তুর্কিস্তানে কামরাগুলোর সাধারণতঃ দুটি অংশ থাকে। সে আমাকে প্রথম অংশটিতে বসিয়ে ভিতরের অংশটিতে কাপড় পাল্টাতে ঢুকলো। ভুলক্রমে মেজের উপর রাখা কাগজগুলো ফেলে রাখলো। আমার দৃষ্টি একটি কাগজের উপড় পড়তেই শাইখ তৌরা খান দামলাসহ অসংখ্য উলামার নাম দেখতে পেলাম। ঝটপট আমি কাগজটি পকেটে ঢুকালাম। ইত্যবসরে আফগানী ইতঃস্তত অবস্থায় এসে কাগজগুলো ভিতরের কামরায় নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে বেরিয়ে এলো এবং আমার সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলতে লাগলো। অল্পক্ষণ পর চলে এলাম। আফগানীর সম্পর্কে আমার ধারণা বাস্তব হলো। আমি কাগজটি শাইখকে দিলাম। শাইখ সেটি নিজের কাছে রাখলেন এবং আমাকে খুব দু'আ দিলেন। দুই-তিনদিন পর আফগানী উধাও হয়ে গেলো। সম্ভবতঃ মুজাহিদীন তাকে উঠিয়ে নিয়ে ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

আমি হযরতের খিদমতে 'শরহে আকায়িদ নসফী' পড়ার আগ্রহ পেশ করলাম। হযরত বললেন, আমাদেরকে 'ফিক্‌হে আক্‌বার' এবং 'কাসীদায়ে আমালী' পড়া উচিত। এর মাধ্যমে আমরা কমিউনিজম এবং বস্তুবাদের খণ্ডন করতে পারবো। এ যুগে ইউনানী দর্শন কোন কাজে আসতে পারে না। সুতরাং তার পিছে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আমি আরয করলামঃ হযরত যেভাবে বলেন, সেভাবেই এ অধম রাজি আছে। তখন হযরত বললেনঃ প্রত্যহ বাদ ইশা এই গরীবখানায় এসো।

ইরশাদ অনুযায়ী হাজির হতে থাকলাম। একুশ দিন তরবিয়তের পর আমাকে টুপি বাজার মসজিদের ইমাম পদে নিয়োগ দিলেন। টুপি বাজার মহল্লায় ইয়াহুদী ও আরমানীরাও থাকতো। কমিউনিষ্টদের একটা অফিসও ছিলো। নামাযের পর কুরআনে কারীমের দরস্ দিতাম। সাথে সাথে জরুরী আকায়িদও বর্ণনা করা হতো। দরস ও বয়ান বেশ কার্যকরী হলো। কমিউনিষ্টদের এটা ভালো লাগলো না। তারা প্রশ্ন উঠালো ইমাম সাহেব সাবালক নয়। কারণ তার এখনও দাড়ি উঠেনি। হযরতকে জানালাম। হযরত বললেনঃ স্থানীয় একজনকে নামায পড়াতে দাও। আর দরস তুমি নিজে চালাতে থাকো।

উস্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে থাকলাম। কয়েকদিন ভালো মতোই কাটলো। এরপর আবারো একটি অভিযোগ উত্থিত হলো। এবারের অভিযোগ

হলো ইমাম সাহেবের পাসপোর্ট বা পারমিট নাই। উল্লেখ্য যে, স্যোশালিষ্টরা ক্ষমতা দখলের পর একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্যও পারমিটের ব্যবস্থা করেছিলেন। যাহোক এ সমস্যার সমাধান এক কমিউনিষ্ট করেছিলো।

খোকন্দের সার্বিক পরিস্থিতি

খোকন্দে কোন রকম দিনাতিপাত করছিলাম। পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। উলামায়ে কিরাম তেমন সংঘবদ্ধ নন। বহিঃবিশ্বের সাথেও তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। সাংগঠনিক তেমন কোম ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী সরকারের মোকাবিলা করতে সাংগঠনিক মজবুতি, শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ অনেক কিছু দরকার। সর্বপ্রথম দরকার ঐক্য। এসবের অনেক কিছু তুর্কিস্থানের উলামায়ে কিরামের ছিলো না। তবে বেশ কিছু উলামায়ে কিরাম স্ব-স্ব অনুসারী নিয়ে, চেষ্টা চালাননি তা নয়। মাদ্‌রাসা বেগ-এর প্রধান মুহিউদ্দিন মাখদুমের বক্তৃতা খুবই প্রভাবান্বিত ছিলো। তিনি বিভিন্নস্থানে বয়ান করতেন ও কমিউনিষ্টদের অপবাদের জবাব দিতেন। এছাড়াও স্থানে স্থানে উলামায়ে কিরাম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তাবলীগ ও ইশাআতের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার চাইতে প্রতিরোধ হতো আরো কঠিন। সোচ্চার উলামায়ে কিরামকে রাতের আঁধারে গুম করে দেয়া হতো। কখনো কখনো বাসা থেকে এই বলে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো যে, দু/চার দিন পর ফিরে আসবেন। কিন্তু পরবর্তীতে আর কোন সংবাদই পাওয়া যেতো না। আবার কাউকে সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড বরফময় এলাকায় দেশান্তর করা হতো।

খোকন্দ থেকে যাবার পালা এলো

টুপি বাজার মসজিদে আমার দরস ও তাদ্‌রীসের কাজ নিয়মিত চলছিলো। তাই পার্টির (কমিউনিষ্ট) মিটিংয়ে আমাকে গুম করার সিদ্ধান্ত হলো। রাত তিনটা বাজে একজন নওজোয়ান এ খবর দিলো। সে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলো এবং কট্টর কমিউনিষ্ট ছিলো। আন্তরিকভাবে দেশের চলমান পরিস্থিতির দরুণ খুবই ব্যথিত ছিলো। এই ছেলেটিই আগে আমার পাসপোর্ট ও পারমিটের ব্যবস্থা করেছিলো। আমার উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো, যাতে আমি পালাতে না পারি।

সকাল হলো। সেই নওজোয়ানের অন্ধ চাচা মীর আইউব আমার কামরায় এসে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়িল জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। বেলা প্রায় এগারোটা। ছেলেটি আসলো, চাচাকে দেখে ইশারায় বাইরে ডেকে নিলো।

বাইরে নিয়ে কানে কানে বললো; আজকে যে কোন সময় ওরা আপনাকে ধরতে আসবে। এই অন্ধ বুড়োকে ওরাই পাঠিয়েছে, যাতে আপনি তার সাথে মত্ত থেকে কোথাও যেতে না পারেন। নওজোয়ান চলে গেলো। কামরায় ঢুকতেই বুড়ো জিজ্ঞাসা করলো কে এসেছিলো? বললাম– এলাকার একটা বখাটে ছেলে। একেবারে সংগোপনে আম্মাজানের দেয়া বিছানাটুকু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে খশ্‌তান মাদ্‌রাসায় গেলাম। সেখানে ক্বারী আঃ মালিক নামক একজন ছাত্র ছিলো। আমার বন্ধু মানুষ। তার বাড়ী পাতিউক এলাকায়। পাতিউক আন্দরজান থেকে চার ক্রোশের বেশী দূরত্বে অবস্থিত। কারী সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি আরেকজন হাফিয সাহেবের সাথে পরিচয় করালেন। যিনি একজন মুজাহিদ ছিলেন। এঁরা তাজিকিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় রুশীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছিলেন। অত্র মাদ্‌রাসায় মক্তবে ও হিফজ বিভাগে পড়াতেন। বস্তুতঃ তাঁর আসল কাজ ছিলো স্থানীয় ছেলেদেরকে মানসিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করা। বক্তৃতাও জানতেন জাদুকরী। তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হবে না, এমন লোক পাওয়া মুশকিল।

এখানে এক সপ্তাহ থাকলাম। ইতোমধ্যে খোকন্দে তুমুল বিশৃঙ্খলা হলো। গণহত্যায় হাজারো মানুষ শহীদ হলেন। অসংখ্য উলামায়ে কিরামকে দেশান্তর করা হলো। সেখানের বাহাদুর জনতাও চরম প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। কমপক্ষে দশ হাজার রুশী সৈন্য জাহান্নামী হলো। মুসলমানরা মাথায় কাফন বেঁধে মাঠে অবতীর্ণ হলেন। পরিশেষে কমিউনিষ্টরা লড়াই থামিয়ে দিলো।'

আমি এখান থেকে সমরকন্দে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। রওয়ানা হওয়ার সময় কারী সাহেব বিশ সের চাউল দিয়ে বললেন, সমরকন্দে গিয়ে বিক্রি করলে আপনার রাহা খরচ হয়ে যাবে।

সমরকন্দের পথে রওয়ানা

অনেকটা নাটকীয় ভাবে সমরকন্দের টিকেট পেলাম। সন্ধ্যা আটটা বাজে ডাক গাড়ীতে উঠলাম। পরের দিন খাওয়াছে পৌঁছলাম। এটি একটি রেলওয়ে জংশন। একটি রেষ্টুরেন্টে চাউলগুলো চল্লিশ রুবেল (রাশিয়ান মুদ্রার নাম) দিয়ে বিক্রি করলাম। এখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিলো। কমিউনিষ্টরা কৃষকদের কাছ থেকে চাউল-ডাল সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। হোটেল মালিক আমাকে সমরকন্দী পোষাক পরার পরামর্শ দিলো। হোটেল মালিকের পরামর্শ মোতাবেক সমরকন্দের লম্বা হাতা বিশিষ্ট কোট কিনলাম। এখন যেন আমাকে হুবহু সমরকন্দী দেখাচ্ছে।

মোল্লা বুখারীর সাথে সাক্ষাত ও কথোপকথন

সমরকন্দে পৌঁছে তিলাকার মাদ্‌রাসায় উঠলাম। প্রথমে কারী সাহেবের এক বন্ধুকে খুঁজলাম, যার কথা কারী সাহেব বলেছিলেন। কারী সাহেবের বন্ধু আমাকে শহর থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে মাইমুন কাস্‌লাক নামক স্থানে পৌঁছিয়ে দিলেন। এখানে একজন আলেমে দ্বীন দামলা বুখারী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সর্বস্তরের লোকের আনাগোনা ছিলো তাঁর দরবারে। এক কথায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় দামলা বুখারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কারী আঃ মালিক তাঁর নামে একটি পত্র দিয়েছিলেন। আমি সেই পত্রটি পেশ করলাম। কিন্তু তিনি পত্রটি নিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন; "আমি কারো থেকে কোন ধরনের চিঠি-পত্র না নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি। ঠিক এমনিভাবে কারো কোন গোপন কথা না শুনার এরাদা করেছি।" এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত স্নেহ সুলভ আচরণ করলেন। নিজ হাতে চা বানিয়ে সামনে দিলেন। আমি আরয করলাম- কারী আলমাস আপনাকে সালাম বলেছেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত সালামের জবাব দিতে থাকলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেনঃ

আলমাস দোস্‌ত্‌ হাস্‌ত্‌- আলমাস তোমার বন্ধু?

আমি বললাম ঃ দোস্‌ত্‌ হাস্‌ত্‌- জ্বী। আলমাস আমার বন্ধু।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখন কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে করেছো- বুখারা না শহরে সব্‌জ্‌? বললাম- শহরে সব্‌জ্‌। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেখানে কে আছেন? বললাম- সেখানে আমার মামা থাকেন। মামার নাম বললাম। তিনি চিনলেন। পরক্ষণে বললেন, তিনি আমার মেজো মামা মুহিউদ্দীন তৌরা খানের ছাত্র। অত্যন্ত খুশী হলেন। খুব দু'আ দিলেন। সাথে সাথে বললেন- "মুসলমানদের চরম পরীক্ষার সময় এসে গেছে। কে কতটুকু খাঁটি মুসলমান, তার পরীক্ষা হচ্ছে।"

মোল্লা বুখারী সপ্তাহে একদিন পবিত্র কুরআনের পাঠদান করেন। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোক সব ধরনের ঝুঁকি নিয়ে সেই দরসে উপস্থিত হয়। মাইমুন কাস্‌লাকের একটু দূরে পর্বতমালা শুরু। এটি তখ্‌তা কারাচা পর্বতমালা নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্বত মালায় মুজাহিদীনের মারকায (কেন্দ্র)। মুজাহিদীনে কেরাম প্রত্যহ কোন সময় নীচে নেমে রুশীদেরকে মজা চাখিয়ে ঠিকানায় ফিরে যান। দামলা বুখারী কমিউনিষ্টদের অপ-প্রচারের জবাবও দেন। সাথে সাথে মুজাহিদদের তরবিয়তও দেন।

একদিন তিনি বললেনঃ আমরা তুর্কিস্তানী মুসলমান আল্লাহর নিয়ামতের না-শুকরীতে লিপ্ত আছি। বিশেষতঃ উলামায়ে কিরাম এমন বিভোর গাফলতে

মশগুল যে, মাথার উপর টর্নেডো-সাইক্লোন ঘুরছে, তবুও তাদের কোন খবর নেই। কেউ কেউ যদি জাগ্রতও হই, সেটাও সে সময়, যখন মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকা অর্ধেক পানির নীচে ডুবে গেছে। এই মুহূর্তে গাফলতির ন্যায় মহা-পাপের কাফ্‌ফারা প্রাণ নিয়ে খেলে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

বুখারার পথে রওয়ানা

বুখারী সাহেবের খিদমতে এক সপ্তাহ থাকলাম। এরপর রওয়ানা হলাম বুখারার পথে। বুখারা থেকে সাত/আট মাইল দূরে বাগান রেলওয়ে জংশন। এখান থেকে বুখারা পর্যন্ত মিটারগেজ লাইনে ট্রেন চলে। আমি গাড়ীতে চড়া ব্যতিরেকে পদব্রজে যাত্রা শুরু করলাম। রাত হলো, একটি গ্রামে ঢুকে পড়লাম। মসজিদে নামায পড়ে শুইতে লাগলাম, ইমাম সাহেব বাধা দিলে কথা শুরু হলো। ইমাম সাহেব বললেন, মসজিদে শোয়া-ঘুমানো মাকরূহ। আমি বললাম, মুসাফিরের জন্য মাকরূহ নয়। পরিশেষে ইমাম সাহেব বললেন; ফিরকার পক্ষ থেকে নিষেধ রয়েছে। আমি বললাম–ফিরকা! সেটা আবার কি বস্তু! ফিরকা কিরে বাবা? ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বললেন– গ্রাম্য! ফিরকা চিনো না? ফিরকা হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টি।' আমি বললাম– কমিউনিষ্ট আল্লাহর দুশমন। মসজিদের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? ইমাম বললেন– মুর্খ ছেলে! তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি উজবেক, তাজিক, কার্‌গীজ, তাজিল না কি তুর্‌কামান? আমি বললাম– উজবেক। ইমাম বললেন– তাহলে তো এখানে আসারই তোমার অনুমতি নেই। ভালো চাইলে জলদি পালাও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মসজিদ থেকে বের হলাম এবং গ্রামের বাইরে একটি গাছের তলায় রাত্রি যাপন করলাম। সকালে নামায পড়তে মসজিদে এসে দেখি মসজিদ তালাবদ্ধ। তাই দেরি না করে নামায পড়ে বুখারার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। সকাল আটটার দিকে শহরে পৌঁছলাম। গাজদানী মহল্লাতে একটি সুদর্শন মসজিদ দেখা গেলো। ভিতরে গিয়ে দেখলাম কিছু মহিলা কাপড় ধুইছে এবং কিছু লোক তাবু টানিয়ে রেখেছে। পরে জানতে পারলাম যে, এরা ইয়াহুদী কমিউনিষ্টদের পরিবারের লোকজন। স্যোশালিষ্টরা এদেরকে এখানে স্থান দিয়েছে।

বাইরে বের হলাম, অনেক দূরে ব্যাণ্ডের বাজনার আওয়ায শোনা যাচ্ছিলো। আস্তে আস্তে আওয়াজ বেশী হচ্ছিলো। মনে করলাম কোন মিছিল হবে। কয়েক মিনিট পর পুরো দৃশ্যটাই প্রতিভাত হলো। আগে আগে সৈন্যদল ব্যাণ্ডের তালে তালে মার্চ করছিলো। আর পিছে অসংখ্য কমিউনিষ্ট সারিবদ্ধভাবে তাদের পতাকা উঁচিয়ে যাচ্ছিলো। প্রত্যেক লাইনে একজন করে পুরুষের পিছে একজন

করে নারী। মিছিলটি দেওয়ানে বেগী নামক একটি হাউজের কাছে গিয়ে থামলো। "বে-পর্দা দিবস" হিসাবে এই দিনটি উদযাপন করা হচ্ছিলো। এ উদ্দেশ্যেই মিছিলের আয়োজন। কয়েক বছর পূর্বে এই দিনে লাল সৈন্যরা মুসলমান মহিলাদের থেকে বোরকা ছিনিয়ে নিয়ে তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। যেসব মহিলা বোরকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো, তাদেরকে এবং তাদের অভিভাবকদেরকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে বোরকা দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। এরপর থেকে ওরা প্রত্যেক বছর এ দিনটি "বে-পর্দা দিবস" হিসাবে উদযাপন করে।' মিছিল শেষে তারা মিটিংয়ের আয়োজন করে। মিটিংয়ে ইসলামী বিধানাবলী নিয়ে অকথ্য উক্তি করা হয়। পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত পাশ করা হয় যে, সকল বড় মসজিদে লেনিনের মূর্তি স্থপন করা হবে।

বুখারার কিছু হাল-অবস্থা

সারা তুর্কিস্তান জুলুমের যাতাকলে পিষ্ট ছিলো। কিন্তু বুখারার মুসলমান যেসব জুলুমের শিকার ছিলো, তা বর্ণনাতীত। বুখারায় আমি মাত্র তিন দিন ছিলাম। কিন্তু তিন দিন তিন বছরের চেয়েও বেশী মনে হয়েছিলো। এখানে আল্লাহ-রাসূল তথা ইসলাম বিরোধী কি ধরনের প্রোপাগাণ্ডা করা হয়েছে, তা উপস্থিত লোকেরাই বলতে পারবে। সকল ধরনের মানবাধিকার পদদলিত হয়েছিলো। ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততার ঘোষণা দেয়া মানে নিজের জন্য আজাব ডেকে আনা।

বুখারায় আটশো দ্বীনী মাদ্‌রাসা ছিলো। কিন্তু এখন সবগুলোই قال الله (ক্বা-লাল্লাহ) এবং قال الرسول (ক্বা-লার রাসূল)-এর আওয়াজ থেকে বঞ্চিত। কোনটি আস্তাবল বানানো হয়েছিলো, কোনটি গুদাম, কোনটি ক্লাব, কোনটি সার্কাস ঘর আবার কোনটিতে ইয়াহুদী ও অন্যান্য ধর্মের লোকেরা থাকতো। অনেক মসজিদ তালাবদ্ধ ছিলো। প্রত্যেকে অন্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। ধর্মীয় নেতাদের কাউকে শহীদ করা হয়েছে, আবার কাউকে দেশান্তর করা হয়েছে। আর জেলখানা দ্বীনদার মুসলমানে ভরপুর ছিলো। জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলো। ফারগানা ও সমরকন্দে কম-বেশী সংঘর্ষ হচ্ছিলো। আর এই তাইমুর লংয়ের বুখারার জনগণের ক্রোধ, ব্যক্তিত্ববোধ, অস্তিত্ববোধ ও স্বকীয়তাবোধের জানাযা যেন বহুপূর্বেই পড়ানো হয়েছিলো। মনটা খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। ইমাম বুখারীর এই বুখারা আজ বিরানভূমি। ভীষণ মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডের প্রসিদ্ধ মাফ্‌ফাক মসজিদে আশ্রয় নিলাম। ইস্তেখারা করার ইচ্ছে করলাম। দেখা যাক, পথ প্রদর্শক প্রভু থেকে কোন রাহনুমায়ী পাওয়া যায় কিনা। উজু করলাম। দু'রাক্‌আত নামায পড়লাম। ইস্তেখারার দু'আ পড়ে শুয়ে পড়লাম।

সুব্‌হে সাদিকের সময় মু'আজ্জিন এলেন; এরপর আরো দু'জন লোক এলেন। চারজন জামাআত করে ফজরের নামায আদায় করলাম। তারপর লোকমুখে শুনলাম– রাতে শহরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছিলো। মূল ঘটনা এই ছিলো যে, কমিউনিষ্টরা ইসলাম বিরোধী একটি মিছিল বের করেছিলো। এতে বেশ কজন মুসলমান যুবক ক্ষুব্ধ হয়ে কমিউনিষ্টদের দু/তিনজন শীর্ষস্থানীয় লোককে হত্যা করে ফেলে। এর পাল্টা জবাবে কমিউনিষ্ট পার্টির গুণ্ডা-পাণ্ডা আর লালবাহিনী যৌথভাবে পুরো শহরে গণহত্যা চালায়। যাকে যেখানে পেয়েছে, তাকে সেখানে হত্যা করেছে। এক পর্যায়ে ঘর থেকে টেনে বের করে হত্যা করেছে। সকাল বেলা বুখারার অলিতে-গলিতে শুধু লাশের স্তূপ। আর ড্রেনগুলোতে রক্তের স্রোত। যার দরুণ মসজিদে মাত্র দু'জন লোক এসেছে।

রাখেন আল্লাহ্ মারে কে?

দুপুর পর্যন্ত মাফ্‌ফাক মসজিদেই থাকলাম। আনুমানিক এগারোটায় বের হয়ে দেওয়ানে বেগী হাউজে পৌঁছলাম। আমার হাতে মোটা চটের তৈরী একটি ব্যাগ ছিলো। ব্যাগটিতে মুচির সরঞ্জামাদি ছিলো। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক হাটলাম। তারপর সফেদা ফলের একটি গাছের নীচে গিয়ে বসলাম। বেশীক্ষণ দেরি হয়নি একটি নওজোয়ান এলো। আমার বয়সের মতোই তার বয়স হবে। এসে কোন রকম সংকোচ ছাড়া জিজ্ঞাসা করলো– কবে এসেছো? আমি প্রথমতঃ তার অসংকোচ মনোভাবে ঘাবড়ে গেলাম। পরক্ষণেই নিজকে শাম্যলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম– তুমি কবে এসেছো? সে বললো– দু'মাস হলো। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বাড়ী কোথায়? সে বললো– আন্দরজান-এর কালতিপা মহল্লায়।' আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কোথাকার? আমি বললাম– ফায়েকীর। এখানে কি জন্য এসেছো? বললাম কাজের তালাশে। কি কাজ করো? মুচির কাজ করি। সে বললো ঠিক আছে। সব ধরনের কাজ করতে পারো? বললাম, আসলে আমি মোজা তৈরি করতে পারি। সে বললো ঠিক আছে, আসো আমার সাথে। বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে কথা বলি। আমার মোজাও ঠিক করতে হবে।

আমি যুবকটির সাথে চললাম। তার চাল-চলনে মনে হচ্ছিলো যেন সে আমাকে পূর্বে থেকেই চেনে। সতর্কতাবশতঃ সে কয়েক কদম এগিয়ে চলছিলো। বুখারার গলিগুলো খুব সংকীর্ণ ছিলো। গলির উভয় দিকে বড় বড় ইমারত। আমরা চতুর্দিকে দেখে চলছিলাম। হঠাৎ, দেখি ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এলোপাথারি বাড়ি ঘর। কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব, সেটাও মুশকিল। তাই একটি তিন রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবলাম দেওয়ানে বেগী হাউজের পাশে ফিরে যাই। ইতোমধ্যে একটি সুদর্শন লোক এলো। সে আমাকে পেরেশান দেখে জিজ্ঞাসা করলো– আয় বালায়ী! চেরা পেরিশানী ও হয়রানী দারী– ওহে পাহাড়ী!

কি ব্যাপার, তোমাকে বিষন্ন মনে হচ্ছে? আমি বললাম আমি যোহরের নামায পড়বো, চিন্তা করছি কোন মসজিদে পড়বো!

লোকটি বললো, নাদান্ বালায়ী! নামে নামায্ না গীর্; হামরাহে মান্ বশূ; হালাত-মুশদাস্ত-বেকুফ পাহাড়ী! নামাযের নামও মুখে উচ্চারণ করিও না; আমার সাথে এসো, শহরের পরিস্থিতি খুব শোচনীয়। সমস্ত মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

লোকটির সুন্দর পাগড়ী, লম্বা জামা এবং মুখ ভর্তি দাড়ি দেখে ধোকা খেয়ে গেলাম। ধারণা করেছিলাম, কোন মাদ্রাসায় উস্তাদ কিংবা কোন মসজিদের খতিব হবেন। হিতাকাংখী মনে করে তার পিছু পিছু চললাম। আগে গিয়ে দেখি এতো 'মুখ মে শেখ ফরিদ, বগল মে ইট।' যেহেতু আমি স্যোশালিজমের বর্ণনা দিচ্ছি, আর এটি সে সম্পর্কীয় নয়; তাই বিস্তারিত বলবো না। তবে সংক্ষেপে বলছি।

সে আমাকে কিল্লার মতো একটি বাড়িতে নিয়ে গেলো। সে কোন সময় মান্নত করেছিলো; আমাকে সেই মান্নতের কুরবানীর খাসী বানাতে চাচ্ছিলো। রাখেন আল্লাহ, মারে কে? আল্লাহ তা'আলা লোকটির স্ত্রীর ও তার যুবতী মেয়ের হৃদয়ে দয়া ঢেলে দিলেন। তারা লোকটির খঞ্জরের মুখ থেকে আমাকে মুক্ত করে দিলো। ব্যাস, আমি তড়িঘরি কেটে পড়লাম।

এই অবাঞ্ছিত মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাড়িটি থেকে যখন বের হলাম, তখন সন্ধ্যা হচ্ছিলো। জিজ্ঞাসাবাদ করে দেওয়ানে বেগী হাউজের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। দূরের বৃক্ষের গোড়ায় যেন সূর্য ডুবছিলো। রাস্তাগুলো যেন নীরবতার রংবিহীন চাদর আবৃত করে ফেলছিলো। নতুন আরেকটি সমস্যা মাথার উপর। আর তা হলো, রাতে কোথায় থাকবো! ইতোমধ্যে আশার আলো উদ্ভাসিত হলো। সকাল বেলার অযাচিত দোস্ত আভির্ভূত হলো। তাকে খুব বিষন্ন দেখাচ্ছিলো। এদিক-সেদিক উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি আমার উপর পড়া মাত্র দৌড়ে এলো। আমার চটের ব্যাগটি তুলে নিলো। কোন কথাবার্তা ছাড়া হাটতে শুরু করলো। আমি চুপচাপ তার পিছে চলতে লাগলাম। পথিমধ্যে নীরবতা ভেঙ্গে সে বললো– আমি তো নিরাশ প্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। কমপক্ষে দশবার এখানে আসা যাওয়া করেছি। কি হয়েছিলো? আমি বললাম, রাস্তা ভুলে শহরের এক কিনারায় চলে গিয়েছিলাম; সেখান থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এলাম। জিজ্ঞাসা করলো– এখন কোথায় যেতে? বললাম– মাগাক মসজিদে। একথা শুনে সে বিষন্ন হয়ে পড়লো। বলতে লাগলো মাগাক মসজিদের খতিবকেও তার ঘরে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান আলিম ছিলেন। গতকাল কমিউনিষ্ট লোকেরা একটি মিটিংয়ে

বলেছিলো "আমরা খোদাকে বুখারা থেকে বের করে দিয়েছি। এখন আর রূহানীরা জন-সাধারণকে ধোকা দিতে পারবেনা। খোদা-রাসূল সবকিছু রূহানীদের বানানো বস্তু। ঠিক এমনিভাবে বাহাউদ্দীন -এর ওসীয়তনামা রূপকথা ও ভিত্তিহীন বস্তু বৈ কিছু নয়। সে তার অসীয়তনামায় লিখেছে যে– যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কবরের একটি ইট পর্যন্ত বাকি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুফফার এই পবিত্র ভূমিতে কদম রাখতে পারবে না। এই রূপকথারও মুখোশ আমরা উম্মোচন করেছি। তার কবরের প্রত্যেকটি ইট একটি অপরটির সাথে লাগিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি।"

খতীব সাহেব এসব শুনে চুপ থাকতে পারলেন না। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর গর্জে উঠলো। অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় সকল অপবাদের অপনোদন করলেন। দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত করলেন যে, সে অসীয়তনামাটি শাইখ বাহাউদ্দীন (রহঃ) লিখেননি। বরং কমিউনিষ্টরাই লিখে তার প্রচার করে ইসলামের উপর অপবাদ লাগানোর অপচেষ্টা করেছিলো। ইসলাম এসব অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। ইতোমধ্যে সেখানে লাল সৈন্য উপস্থিত হলো। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। রুশী সৈন্যরা স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের সহায়তায় ঘরে ঘরে ঢুকে গণহত্যা চালায়। সেই গণহত্যায় খতিব সাহেবও শহীদ হন।

আমরা ঘরে পৌঁছে গেলাম। এই যুবকটি আফগান রাষ্ট্রদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলো। এক সাথেই থাকে। আমার জন্য সে রহমতের ফিরিশতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। সে আমার পরিচয় পত্র বানিয়ে দিলো, যা পরবর্তীতে ভীষণভাবে কার্যকরী হয়েছিলো।

সেখানে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা হলো। একজন মু'আজ্জিন সাহেবের সাথে কথা হলো। তারপর আমার নওজোয়ান বন্ধু পাঁচ রুবেলের কয়েকটি নোট দিলো। সেগুলো নিয়ে আমি কাগানের দিকে যাত্রা শুরু করলাম।

সফর আগে অব্যাহত রইলো

বুখারা থেকে কাগান আট মাইল দূরে অবস্থিত। উভয় শহরের যাতায়াতের জন্য মিটার গেজ লাইনে ট্রেন চলে। কয়েকদিন যাবত ট্রেন বন্ধ ছিলো। তাই পুরো পথটা হেটেই অতিক্রম করতে হলো। কাগানে একেবারে কেন্দ্রস্থলে বিরাট রেলওয়ে জংশন। এখান থেকে তাসকন্দ, ফারগানা, তিরমিয, ইশ্‌কাবাদ এবং মস্কো সবদিকের ট্রেন ছাড়ে। স্টেশনে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, সপ্তাহে মাত্র একটি যাত্রীবাহী ট্রেন কারশী যায়। বাকী সব গাড়ি সৈন্যদের আসবাবপত্র বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাগানের কাছে পারসিকদের একটি রেষ্টুরেন্ট আছে। আমি ভিতরে গিয়ে বসে গেলাম এবং সবুজ চায়ের অর্ডার দিলাম। একজন বড়সড় লোক চা নিয়ে এলো। টেবিলে চা-দানি রাখলো। আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো– "আয় ইয়ায্দান! হামা আজ্, ব্–হামা নিগ্রান– আয় খোদা! সবকিছু তোমারই পক্ষ থেকে হয়, তুমি সবার হিফাজত করো।

আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লোকটিকে দেখলাম। সে চা রেখে চলে গেলো। তারপর পুনরায় ফিরে এলো এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– আয় বালায়ী! ফারসী মী দানী? ওহে পাহাড়ী! ফারসী জানো? বললাম কিছু কিছু বলতে পারি। সে বললো– তু-আজ্ ফারগানা? শানাখতাম না?– তুমি কি ফারগানার অধিবাসী নাকি ফারগানা চিনোই না? বললাম– শহরে সব্জও ফারগানার মতো স্বাস্থ্যকর এলাকা। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং ফল-ফলাদির কেন্দ্র। এজন্য হয়তো আপনি আমাকে ফারগানার মনে করছেন।

লোকটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর বোল্কা (রূশী মোটা রুটি) নিয়ে এলো। আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে ফেললাম– "আমি বোল্কা খাই না। তারপর থলে থেকে সমরকন্দি রুটির টুকরা বের করলাম। মাইমুন কাস্লাক থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে দামলা বুখারী সাহেব রুটির এ টুকরো ক'টি হাদিয়া দিয়েছিলেন। এ টুকরাটিও সে টুকরোগুলোর অংশ বিশেষ। বড় লোকটি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে দেখছিলো। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন– এ টুকরাগুলো তো মাইমুন কাসলাক-এর মুজাহিদদের উচ্ছিষ্ট– ঠিক নয়? অর্থাৎ, সে বলতে চাচ্ছে যে, এ রুটির টুকরাগুলো মাইমুন কাস্লাকের গেরিলা মুজাহিদদের দস্তরখানা থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। আমি অনেকটা ইচ্ছাকৃত বোকা সেজে বললাম ঃ আমি এতো বেশী ফারসী বুঝিনা। কথাবার্তা বুঝার মতো যৎ-সামান্য ফারসী বুঝি। সে কিছুটা বিরক্তিবোধ করতঃ বললোঃ এ টুকরোগুলো দামলা বুখারীর দস্তরখানার নয়? সেখানে থেকে তুমি আনোনি? আমি বললাম– দামলা বুখারী কে? তার দস্তরখানার সাথে আমার কি সম্পর্ক? সে বললোঃ সেই দামলা বুখারী, যিনি সমরকন্দের উত্তরপূর্বে মাইমুন কাস্লাকে থাকেন। তুমি কি সেখানে যাওনি? আর এখন শহরে সব্জে যাচ্ছো না? শহরে সব্জে তোমার মামা থাকেন না? বড় মিয়া এবার মুখ ভরে হেসে ফেললেন।

আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই বড় লোকটি হয়তো কমিউনিষ্ট গোয়েন্দা ; আমার পিছে লেগে গেছে। অথবা মুজাহিদ গ্রুপের লোক। লোকটি এখনও হাসছিলো। এরপর চা-দানি নিয়ে চলে গেলো। পাঁচ-ছয় মিনিট পর ফিরে এসে বললো– কালকে বুখারায় ভীষণ জুলুম-নির্যাতন হয়েছে। অসংখ্য নিরপরাধ লোক মারা গেছে। কিন্তু এতো কেবল শুরু। দেখুন পানি কোন পর্যন্ত

গড়িয়ে যায়। এরপর হঠাৎ জিজ্ঞাসিলেন– ইশার নামায পড়েছো? আমি বললাম হ্যাঁ! পরক্ষণে বললেন– আজ রাত তিনটায় লোকাল ট্রেন কারশী যাবে, সময় মতো গাড়িতে উঠে যেও।

লোকটির সকল কথাই আশ্চর্যজনক ছিলো। এর অর্থ এই যে, সে আমার সফরের প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি কিছু না বলে চুপচাপ রইলাম। সে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর এসে একটি কাগজের টুকরো দিয়ে বললো, এই নাও এটি কারশীর টিকেট। এখন আমি আশ্বস্থ হলাম যে, বড় মিয়া একজন মুজাহিদ। দুঃচিন্তা কিছুটা দূরিভূত হলো। বুখারার আফগান রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো। তিনিও হয়তো মুজাহিদের লোক। হয়তো তিনিই আমার আসার অগ্রিম সংবাদ এই বড় মিয়াকে দিয়েছেন। আর তার প্রাইভেট সেক্রেটারীও বুঝি মুজাহিদের লোক। তাইতো তিনি নির্দ্বিধায় আমার সাথে কথা বলেছিলেন– হয়তো কোন আলামত দেখেই তিনি আমাকে চিনে ফেলেছিলেন।

বড় মিয়া হাসতে হাসতে বললেনঃ কারী আলামাসী দুরস্ত হাস্ত্– কারী আলমাসী সুস্থ্য আছেন? এরপর খুব গম্ভীর হয়ে বললেনঃ কারশী, গাজার, কিতাব, শহরে সব্জে এখনো পরিস্থিতি শান্ত আছে। কারশীতে গিয়ে দেখবে একটি লাল রেষ্টুরেন্ট আছে, সেখানে অবস্থান নিও; নিরাপদে থাকতে পারবে।

আমি টিকেট এবং চায়ের দাম দিলাম ; বড় মিয়া নিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ এটা তোমার হিসাবে জমা করে দেয়া হবে। ফী আমানিল্লাহ! লোকটি চলে গেলো। আমি পৌনে তিনটায় স্টেশনে পৌঁছলাম। যাত্রী ছাউনীগুলো সব ভর্তি ছিলো। আমার কাছে যেহেতু টিকেট ছিলো, তাই প্লাট ফরমের দিকে এগুলাম। দরজার একজন লাল সৈন্য পারমিট! পারমিট! বলে চিৎকার দিয়ে উঠলো। আমি ইচ্ছাকৃত টিকেটটি দেখালাম। সেও কাগজ দেখামাত্র ছেড়ে দিলো। গাড়ী ঠিক তিনটায় এলো। প্রত্যেকটি ডাব্বার দরজায় একজন করে সৈন্য দাঁড়ানো। সবার টিকেটে ডাব্বা নং লিখা ছিলো। কিন্তু আমার টিকেটে ওসব কিছুর বালাই নেই। যার দরুণ কেউই ঢুকতে দিলো না। ট্রেন ছেড়ে দিলো। একজন সৈন্যকে অনুরোধ করলে তার দয়া হলো এবং ঢুকতো দিলো।

ট্রেনে আমার সাথে ছয়জন রুশী পকেটমারও উঠলো। ডাব্বার পূর্ব দিকের সীটে বিশাল আকৃতির তিনজন উজবেক ছিলো। আমার বাহুর মতো মোটা তাদের হাতের আঙ্গুলী। বিরাট থানের এক একটি পাগড়ী। কিছুক্ষণ পর ছয়জন পকেটমার সবাই একযোগে আমার মাল-পত্র ছিনতাই শুরু করলো। বেদম মারপিট করলো। সাহায্য প্রার্থনা করলে উজবেক তিনজন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। এক পর্যায়ে বদমাআশরা আমার কাঁধে এমন জোরে ঘুসি মারলো যে, আমি চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে উঠলাম–

আয় আল্লাহ! তুমি সহায়! এ কথা বলা শেষ হয়নি, পকেটমারগুলো আবার ফিরে এসে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করলো এবং রূহানী কুত্তা বলে কিল-ঘুসি লাথির বৃষ্টি বহাতে লাগলো। আর তারা লাথির সাথে সাথে বলতে লাগলো–লাথি তোর দ্বীনের উপর, লাথি তোর খোদার উপর, লাথি তোর কুরআনের উপর.......। ওরা ছয়জন। সবাই মিলে আমাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে উদ্দত হলো। ইতোমধ্যে পাশের ডাব্বার দরজা খুলে গেলো এবং রেলওয়ে গার্ড এলো। সাথে সাথে রুশী বদমাআশ পালিয়ে গেলো। আমি গার্ডকে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে পাশের ডাব্বার উপরের সীটে বসিয়ে দিলেন।

শরীরের সকল গিরায় গিরায় ব্যথা শুরু হলো। কিল-থাপ্পরের দরুণ মুখ ফুলে বিগড়ে গেছে। পাশের লোকেরা ঘটনা জানতে চাইলো। সবকিছু শুনে তারা বললো, এটি এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুশী বদআশরা লোকজনের মাল-সামানা যখন-তখন ছিনিয়ে নেয়। মারধর করে। কারো কিছু বলার ক্ষমতা নেই। কেউ প্রতিবাদ করলে তার রক্ষা নেই। বিচার চাইলে উল্টো বিচার প্রার্থীই দোষী সাব্যস্ত হয়। লোকেরা বললো– তুমি তোমাকে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসাবে পরিচয় দাও, তাহলে ভালো হবে। আমি বললাম–তা তো আমি পারবো না।

কিছুক্ষণ পর গার্ড সাহেব রুশী বদআশগুলোকে ধরে আনলেন। সাথে পুলিশ ছিলো। কিন্তু পরক্ষণে আমাকে রূহানী প্রমাণ করতঃ বদমাআশগুলোকে ছেড়ে দিলো।

কারশী শহরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড

কাক ডাকা ভোরে কারশী স্টেশনে পৌঁছলাম। শহরে ঢুকতেই দু'জন তাজিকের সাথে সাক্ষাত হলো। বিশাল বডি আর বিশাল পাগড়ীধারী তাজিক দু'জনকে দেখলে হৃদয় না কেঁপে পারে না। তাজিকরা রুশীদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারি রেখেছিলো। ট্রেনে আমার সাথে কৃত আচরণের বিবরণ শুনে তারা খুবই ব্যথিত হলেন এবং লাল রেষ্টুরেন্টে তাদের সাথে আমাকে রাখলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় রেলওয়ে মাঠে বিরাট একটি গণজমায়েত হলো। এই গণজমায়েতের উদ্দেশ্য ছিলো– কারশী শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম দামলা কারশীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার রায় শুনানি হবে। শহরে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অসংখ্য লোক জমায়েত হয়েছে। রুশী সৈন্যরা গণজমায়েতকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে।

মাঠের এক কোণায় আদালতের ইজলাস বসেছে। হযরত মাওলানাকে কড়া ফৌজি গার্ড দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। মাওলানাকে তাঁর বক্তব্য বলার সুযোগ দেয়া হলো। দামলা কারশী বললেনঃ

মাননীয় আদালত! আমার অপরাধ শুধু এতটুকু যে, আমার উপর শরীয়তের পক্ষ থেকে যে ফরয দায়িত্ব অর্পিত হয়, আমি কেবল সেটি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। এটি আমার পবিত্র দায়িত্ব। অন্যথায় আমি বিশ্ব-প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসিত হবো। সংগত কারণে আমরণ আমাকে এই কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

জজ বললো ঃ তুমি যেটাকে ফরয বলছো, রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। রূহানিয়াতের (ইসলামের) প্রচার-প্রসার, শিক্ষা-দীক্ষাএই ভূ-খণ্ডে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। জাতির জনক কমরেড লেনিনের দেশে একমাত্র তারই আদর্শ চলবে। একমাত্র এখানে কমিউনিজম চালু থাকবে। অন্য কোন কিছু মেনে নেয়া যায় না; চলতে পারে না।

দামলা কারশী ঃ মাননীয় জজ সাহেব! দেখুন আল্লাহ সত্য ; কুরআন, হাদীস, ফিরিশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, মৃত্যু, কবরজগত, আখিরাত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু অমোঘ সত্য। এক মহাপরাক্রমশালী প্রভুর দরবারে আমাদের হিসাব দিতে হবে। দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত বিষয় চুলচেরা তার কাছে বুঝাতে হবে। এই ভূ-খণ্ডের অধিকাংশ মানুষ এসব বস্তুর প্রতি বিশ্বাস রাখে। এ ধার্মিক ভূ-খণ্ডের মানুষের দেশে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার করতে পারা তাদের মৌলিক অধিকার। কমিউনিষ্ট ৪০% ও নয়। সুতরাং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা কোন ধরনের হুমকি-ধমকির মুখে নিজেদের সত্য-শ্বাশ্বত ধর্মকে জলাঞ্জলী দিতে পারে না।'

কুকুরের পেটে যেমন ঘি সহ্য হয় না, ঠিক তেমনি জালিমরা সত্যকথা সহ্য করতে পারে না। দামলা বুখারীর কথা শেষ না হতেই থ্রী-নাট-থ্রী-এর গুলি তার পবিত্র ও স্বপ্নীল বুক ঝাজরা করে দিলো। মর্তের ধুলায় লুটিয়ে পড়লেন এই নির্ভীক খোদার সেনা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই আলিমের নির্মম মৃত্যু দেখে আম-জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাদের ঠেকাতে নির্বিচারে গুলি চালানো হলো– নিরস্ত্র ও নিরীহ লোকদের উপর। আল্লাহ প্রেমিক এই জনতার কেউ কেউ লাল রুশী জালিমদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদের অনেককে জাহান্নামে পাঠালো। এই অবস্থা দেখে আমি মালবাহী গাড়ীর একটি ডাব্বায় লুকালাম। দু/তিন ঘন্টা পর রেষ্টুরেন্টে গিয়ে উঠলাম। দেখলাম আমার তাজিক বন্ধুদ্বয় আমার চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

কতোজন মুসলমান এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো, তা বলা মুশকিল। নানা মুখে নানা কথা। তবে হাজার পার হয়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই।

তিনদিন কারশীতে থাকলাম। চতুর্থ দিন রাতে শহরে সব্জ রওয়ানা হলাম। সেখানের অবস্থা তখনও শান্ত ছিলো। কিন্তু বলা মুশকিল সেখানেও কখন দুর্ঘটনা

হয়। কারশীর এই চরম হত্যাকাণ্ড রুশী কোন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হলো না। বরং উল্টো অন্য ধরনের কিছু খবর ছাপা হলো, যাতে মুসলমানরা আরো উত্তেজিত হয়। পুরো শহর পুলিশ বেষ্টন দিযে রেখেছে। আমি যখন গাজার এর পথে যাত্রা করছিলাম তখনও পুলিশী বেষ্টনী ছিলো। গাজার হয়ে শহরে সব্জ যাবো– ইনশা আল্লাহ।

কারশী থেকে শহরে সবৃজ

কারশী থেকে গাজার পৌঁছলাম। তারপর সেখান থেকে শহরে সব্জ। শহরে সব্জ ছোট্ট সুদর্শন শহর। শহরের চারিদিকে বাউন্ডারী দেয়াল রয়েছে। কারশী থেকে আনুমানিক ছত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রেলওয়ে স্টেশন থেকে শহরের প্রধান ফটকের দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। আমি শহরের বাউন্ডারীর পাশে একটি বড় মসজিদে অবস্থান করলাম। মসজিদ শুধু নয় ; বরং মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিরাট সরাইখানা। মসজিদের বারান্দা ঘেসে একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিত ছিলো। মসজিদের এক পার্শ্বে একটি বড়সড় হাম্মামখানা। অপর পার্শ্বে রকমারি ফুলের বাগান। নদীর তীরে ছিলো বিভিন্ন সারিবদ্ধ গাছপালা। বাগানটির পাশে একটি হল রুম ছিলো, যাতে কম সে কম পাঁচশো লোক বসতে পারবে। মসজিদের চতুর্দিকে ছোট ছোট কামরা। মোটকথা, একটি সুন্দর পরিবেশ নিয়ে মসজিদটি বিদ্যমান ছিলো।

স্টেশন থেকে শহর পর্যন্ত টাংগায় (রিকসার মতো গাড়ী) চড়ে এলাম। শহরের টাংগা স্টাণ্ডে একজন ফল বিক্রেতাকে হযরত খোকন্দী অর্থাৎ মামার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত খোকন্দীর কথা বলায় লোকটি আমার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে রইলো। তারপর টাংগার ভাড়া দিয়ে তার দোকানের উপর তলায় নিয়ে বসালো। নিজ হাতে কীমাক চা বানালো। তুর্কিস্তানীরা বিশেষ মেহমানকে কীমাক চা দ্বারা আপ্যায়ন করে। এই চা এক পোয়া দুধ, আধা পোয়া ঘি, আধা পোয়া বাদাম অথবা আখরোট, আধা ছটাক সবুজ চা আর এক গ্লাস পানি দিয়ে তৈরী করা হয়। চা মেহমানকে পরাটাসহ দেয়া হয়।

চা পান করার পর দোকানদার জিজ্ঞাসা করল–

– আপনি তৌরা হযরতের মেহমান?

– আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন?

– আপনার আকার-আকৃতি এবং স্বভাব চরিত্র দেখে।

– খোকন্দী হযরত আমার মামা।

– আপনি এর আগে এখানে এসেছিলেন?

– না কোনদিন আসিনি। এমনকি আমি মামাজানকেও দেখিনি।

– সরাসরি আসছেন নাকি রাস্তায় কোথাও থেমেছিলেন?

– তিনমাস আগে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। খোকন্দ, সমরকন্দ, বুখারা,কাগান, কারশী এবং গাজার হয়ে এখানে আসছি।

– কারশী থেকে কবে বের হয়েছেন?

– গতকাল সন্ধ্যায়।

– তাহলে তো আপনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। আরাম করুন। আমি আসা পর্যন্ত বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

– মনে মনে বললাম অত্যন্ত চালাক লোক মনে হচ্ছে। হয়তো চেহারা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে, আমি ভয় পাচ্ছি।

– সে বললো– কাল থেকে শহরে লাল বাহিনী টহল দিচ্ছে। খোকন্দী হযরতের কিল্লায় তো কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করেছে। আমার নাম তাইমুর বেগ। খোকন্দী হযরতের নগন্য একজন খাদিম।

– আমি বললাম– চতুর্দিকে একি শুরু হলো?

– দেখুন– বুখারায়ও অবর্ণনীয় জুলুম হয়েছে। কারশীতেও একজন বড় আলিম মুফতী খালিমরাদ দামলাকে লাল বাহিনী গুলি করে শহীদ করে দিয়েছে। মুসলমানরা প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে একথা তাদের জানা থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঘরে তল্লাশী চালানো হচ্ছে। এখন শুধু অজো পাড়া-গাঁ ও চরাঞ্চলগুলো বাকি রয়েছে। এখানে একজন আফগানী আলিম এবং পীর সাইয়িদ জালালুদ্দীন আছেন ....।

– আপনি তাঁকে চিনেন? আমি একটু ঠেস দিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।

– জ্বী-হ্যাঁ! তিনি গাজারে থাকেন। খোকন্দী হযরতের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক সপ্তাহে পঁচিশ-ত্রিশজন বিশাল আকৃতির মুরিদ নিয়ে আসেন। দু/তিনদিন হযরতের মেহমানখানায় থেকে যান। কিন্তু তিনি এমন মানুষ..........। (দোকানদার আমতা আমতা করে চুপ হয়ে গেলো)।

–তিনি কি রকম মানুষ? আমি কথা আগে বাড়ানোর জন্য পুনরায় এরূপ জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেলো, মনে হয় সে চাচ্ছিলো, আমি তাকে এরূপ প্রশ্ন না করি।

– তৌরাজাদা! এই প্রশ্নের উত্তর কালকে দেবো। এখন আমি হযরতের কিল্লার দিকে যাচ্ছি। সম্ভব হলে আপনার আসার খবরও জানিয়ে দেবো।

একথা বলে লোকটি চলে গেলো। আমি বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম। কয়েকদিনের ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত শরীর। শোয়ামাত্র চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো।

সন্ধার কিছুক্ষণ পূর্বে তাইমুর বেগ এসে আমাকে জাগালো। সাথে সে একথাও জানালো যে, শহরের পরিস্থিতি খুব শোচনীয়। খোকন্দী হযরতকে বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। এজন্য কোন মুসলমান কর্মস্থলে যায়নি। দোকানপাট অফিস-আদালত প্রায় সবকিছু বন্ধ। রুশী সেনাবাহিনী পাগলা কুত্তার মতো হাটে-বাজারে টহল দিচ্ছে। জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য ফাঁকা ফায়ারিং করছে। এই মুহূর্তে মামার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া ঠিক হবে না। আমি একটি বড় মসজিদে আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি। মসজিদটির ইমাম ও উস্তাদ খোকন্দী হযরতের সহপাঠী। হ্যাঁ! আর একটা কথা মনে রাখবেন, সেখানে কেউ আপনার পরিচয় জানতে চাইলে বলবেন– আমি মুতাওয়াল্লী সাহেবের গোমস্তা। গাজারে তার জমি-জমার দেখাশুনা করি। একথা বলে তিনি আমাকে কাত্তাহ মসজিদে রেখে এলেন এবং তথায় একটি কামরায় থাকারও ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে শুনলাম– তাইমুর বেগ মামার ঘনিষ্ঠ লোক।

শহরে সব্জে কমিউনিষ্টদের ধর্মবিরোধী মিটিং ঃ অতঃপর .....

উক্ত রাতেই কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বোচ্চ কমিটির মিটিং হলো। সেখানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমস্ত বড় বড় মসজিদের মুতাওয়াল্লী সাহেবের কাছে এই নোটিশ পাঠানো হলো যে, অমুক তারিখ মাগরিব থেকে নিয়ে সকাল আটটা পর্যন্ত মসজিদসমূহ ফেরকার (কমিউনিষ্ট পার্টির) হাতে দিয়ে দিতে হবে। ফেরকা সেখানে বিশেষ প্রোগ্রাম করবে।

ভীষণ দুঃচিন্তায় পড়ে গেলেন মসজিদের মুতাওয়াল্লীগণ। নানা চিন্তা-ভাবনা করে পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো এবং থানা কর্তৃপক্ষের সাহায্য কামনারও সিদ্ধান্ত হলো। পরামর্শ মতো পত্রিকায় বিবৃতি পাঠানো হলো এবং থানার সাহায্য কামনা করা হলো। কিন্তু পত্রিকায় বিবৃতি ছাপানো হলো না। থানা কর্তৃপক্ষও সাড়া দিলো না। অবশেষে মসজিদ ফেরকার হাতে দিতে হলো। নোটিশ দেয়ার চতুর্থ দিন কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত বড় মসজিদসমূহে মিটিংয়ের আয়োজন করলো। মহল্লাবাসী সবাইকে নিজ নিজ স্ত্রী-কন্যা বউ-ঝি মসজিদে নিয়ে আসার জন্য বাধ্য করা হলো। পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে এলাকার সকল শ্রেণীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে মসজিদে জমায়েত করলো। মহিলাদের বোরকা-ওড়না মসজিদের বারান্দায় জমা করে পুড়িয়ে দেয়া হলো। এরপর থেকে শুরু হলো পর্দার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা। একজনের পর আরেকজন এভাবে পর্দা বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে চললো। এক পর্যায়ে একজন ইয়াহুদী কমিউনিষ্টের পরিচয় এভাবে দেয়া হলোঃ “এখন

আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন বাশ্‌কিরিস্তানের অধিবাসী, বিশ্বমানবতার মুক্তিদাতা, কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম সদস্য; যিনি এক সপ্তাহ পূর্বে কারশী থেকে এখানে শুভাগমন করেছেন।"

সে লোকটি তার পর্দা বিরোধী বক্তৃতায় বললোঃ "পর্দা মহিলাদের জন্য জুলুমের আলামত। এখন নারী মুক্তির যুগ। অধিকাংশ নারীরা মুক্ত। তারা এখন অফিস-আদালতে চাকুরী করতে পারবে। ফারগানার অভিজাত অধিবাসীরা এর বাস্তবতা বুঝতে পেরেছে। তাদের নারীরা নারী স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে। বিয়ে-তালাক ইত্যাদি থেকেও তারা মুক্ত। তারা পুরুষদের জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন করছে। হায়! এই মুহূর্তে ফারগানা, সমরকন্দ, অথবা বুখারার যদি কেউ এখানে উপস্থিত থাকতো, তাহলে আমার কথার সত্যায়ন করতে পারতো। (নাউজুবিল্লাহ)।

এই দ্বীন, খোদা, রাসূল, কুরআন, কিয়ামত, হিসাব-কিতাব, ফিরিশতা, দোযখ আর জান্নাত সবকিছুই ভিত্তিহীন। (নাউজুবিল্লাহ্)। এসব সমাজপতিরা এবং রূহানীরা (উলামা-মাশায়িখ) বুদ্ধি-পরামর্শ করে তৈরী করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)। আর জাতির জনক কমরেড লেনিন এবং ষ্টালিন ধোকাবাজির সকল জাল ছিন্ন করেছে। তাদের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছানোর এবং তাদের সেই মহান পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করার জন্য আজকের মিটিংয়ের আয়োজন। এই লোকটির কথাগুলো তুলনামূলক কম ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিলো। কিন্তু তারপর যে ইয়াহুদী কমিউনিষ্টটি স্টেজে দাঁড়ালো, সে চরম ধৃষ্টতা দেখালো। একেবারে লাগামহীন কথাবার্তা শুরু করলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি তাকে পড়লো। বানরের মতো লাফ দিয়ে তাক থেকে পবিত্র কুরআনে কারীমের একটি কপি উঠালো। তারপর তা বারান্দায় নিয়ে গরম ছাইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করলো। (নাউজুবিল্লাহ)। তারপর চিল্লাতে চিল্লাতে ভিতরে এসে বললোঃ আমরা শহরে সব্‌জের কমিউনিষ্ট অঙ্গীকার করছি যে, এসব কুসংস্কারবাদীদেরকে প্যান-প্যানাতে দিবো না। যেমনিভাবে আমরা বুখারা-সমরকন্দ এবং ফারগানার রূহানীদের কেন্দ্রসমূহ জয় করেছি এবং সেখানের জন-সাধারণ খোদ রূহানীদের ধোকাবাজির পর্দা উম্মোচন করেছে, এখানেও আমরা সেরকম করবো।"

আমার আর সহ্য হচ্ছিলো না। আমি দাঁড়িয়ে তার অপলাপের জবাবে উদ্বত হচ্ছিলাম, ইত্যবসরে তাইমুর বেগ বলে উঠলেনঃ তুমি ইয়াহুদীর বাচ্চা। এই মহল্লা এবং মসজিদ মুসলমানদের। এই শহরে তোমাদেরও ছয়টি পুজাঘর আছে। পারলে প্রথমে সেগুলোতে আগুন লাগাও। তখন বুঝাতে পারবো যে, তুমি কতোটুকু কমিউনিষ্ট। আর তুমি বুখারা-ফারগানার কথা বলছো যে, সেখানকার

উলামা ও আম-জনতা সেচ্ছায় কমিউনিজমকে কবুল করে নিয়েছে ; এটা একদম মিথ্যা কথা। আমার সাক্ষী স্বরূপ এই নওজোয়ান রয়েছে। তাইমুর বেগ আমার দিকে ইশারা করা মাত্র আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং অত্যন্ত জোশের সাথে বললামঃ বাশ্‌কিরিস্তানী বন্ধু যা কিছু বলেছে, তা সব মিথ্যা। ফারগানা ইত্যাদি এলাকার উলামা-জনতা তো কমিউনিষ্টদের অপবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

এতোটুকু বলার বাকী ছিলো; মুহূর্তের মধ্যে মসজিদ রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো। শহরে সব্‌জের চেতনাবোধসম্পন্ন মুসলমান বদ্‌মা'আশদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মিলিশিয়ার কয়েকজন সিপাহী দৌড়ে এলো। মিটিং সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো এবং নির্দেশ দেয়া হলো যে, সবাই যেন নিজ নিজ ঘরে চলে যায়।

আমরা রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলাম যে, এমনি এক মুহূর্তে রুশী সেনা ও চরমপন্থী কমিউনিষ্টরা এমন ধৈর্য্যের পরিচয় দিলো। কোন ধরনের রক্তারক্তি ছাড়াই মিটিংয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো! পরবর্তীতে জানা গেলো যে, আসল ব্যাপারটি অন্য রকম ছিলো। এই মসজিদের মতো, অন্যান্য মসজিদেও যখন মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তখন তাদের উপর চরম জুলুম শুরু হয়। সাথে সাথে মুসলমানরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ওদেরই অস্ত্র-সস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদেরকেই নিশানা বানায়। এমতাবস্থায় সব মসজিদ থেকে অতিরিক্ত সৈন্যের তাগাদা দেয়া হয়। যার দরুণ সৈন্যের সংকট সৃষ্টি হয়। এরই ফাঁকে ওরা বেশ কটি মসজিদে জুলুম চালাতে অসমর্থ হয়। আমাদের মসজিদটির ব্যাপারটিও এমনি ঘটনার অন্তর্ভূক্ত।

পরের দিন সৈন্যরা সবাই নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে গেলো। মামার কিল্লাও মুক্ত করে দেয়া হলো। এমন দয়াদ্র ব্যবহার একেবারে ধারণাতীত ছিলো। মনে হয় কমিউনিষ্টরা একটি পরীক্ষামূলক এ্যাকশনে এসেছিলো। তারা দেখলো, জনগণ দেশের অন্যান্য এলাকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত কিনা। তারা এটাও আন্দাজ করলো যে, মুসলমানদের তাদের তাহজীব-তামাদ্দুন ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি কতোটুকু শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সাথে সাথে তারা আরো দুটি বস্তু বিশেষভাবে দেখলো। সেগুলো হচ্ছে–১. জনগণের রুখ কোনদিকে। ২. উলামা ও জনসাধারণের দুর্বল সাইড কোন্ কোন্‌টি; যেদিক দিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয়।

এ ধরনের পরীক্ষামুলক দুর্ঘটনা প্রায় প্রত্যেক এলাকায় পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছিলো। আর এসব কাজে অপরিচিত এবং তৃতীয় শ্রেণীর কমিউনিষ্টদের ব্যবহার করা হতো। যাতে করে সরকার পরবর্তীতে এ ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণ অস্বীকার কিংবা এসব কিছু অবুঝ লোকের কাজ বলে চালিয়ে দিতে পারে। মোটকথা, খুবই পরিকল্পিতভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছিলো।

এমনকি এসব কাজে জড়িত দু'একজনকে দোষী প্রমাণিত করে (অথচ সে তাদের দলের লোক) ফাঁসি দিয়ে দিতো। যাতে আম-জনতা বুঝে যে, সরকার আমাদের পক্ষেই রয়েছে। এরপর তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অপারেশন কার্যকর করে ফেলতো।

সৈন্যরা ব্যারাকে চলে যাওয়ার পর পুরো শহরে যেন শান্তির বাতাস বয়ে গেলো। এ সময় আমি তাইমুর বেগের সাথে মন খুলে কথা বললাম। এখন জানলাম যে, তিনি মামার সামরিক উপদেষ্টা। এ কাজে তিনি বুখারা, সমরকন্দ এবং তাসকন্দ ইত্যাদি স্থানে বহুবার সফর করেছেন। রাতের ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেনঃ "ওরা এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটাতে পারে। এগুলোতে যদি কৃতকার্য হয়, তাহলে আরো কঠিন অপারেশনে যাবে।" এরপর তিনি মামার খোঁজ নিতে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল বদনে এসে বললেনঃ মহল্লার কয়েকজন কুটিল ইয়াহুদীর ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে লালবাহিনীর কয়েকজন সদস্য হযরতের খানকায় তল্লাশি চালায়। ইয়াহুদী কুচক্রীরা বলেছিলো, "এই ঈশান (পীর সাহেব) মানুষের রক্ত নিয়ে ভয়াবহ খেলায় মত্ত। জনসাধারণকে 'ফেরকা'-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

তল্লাশির পর তারা দু'জোড়া ঢিলাঢালা জামা, একজোড়া ব্যবহারিক জুতা, একটি তামার কেটলী, ভেড়ার একটি রঙ্গিণ চামড়া, একটি মোটা কম্বল আর একটি মাটির চায়ের কাপ পেলো। তারপর মেহমানখানার তল্লাশি করলো। সেখানে একটি রেজিষ্টার খাতা পেলো। যাতে আয়-ব্যয়ের পরিষ্কার হিসাব লেখা ছিলো। কে কতো দিয়েছেন, কতো ব্যয় হলো, কোন্ খাতে ব্যয় হলো, তা তন্নতন্ন করে লিখা ছিলো। এ ধরনের হিসাব দেখে ওরা কিছুটা হতবাক হলো। পরিশেষে ওরা কিছু না পেয়ে চুপচাপ চলে গেলো। আসলে ওরা হযরতকে হয়রানি করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই ষড়যন্ত্রের এটি একটি প্রাথমিক এ্যাকশন ছিলো।"

এক সপ্তাহ পর পরিকল্পিতভাবে শহরে সব্জের সব এলাকায় জোরে-সোরে ঘোষণা দেয়া হলো যে, "গত সপ্তাহে যেসব লোক কমিউনিষ্ট পার্টির নাম ভাংগিয়ে যে দুঃখজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ-জনতার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে, তাদেরকে যথোচিত শাস্তি দেয়া হয়েছে। সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। সরকার কখনোই দেশবাসীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ হাসিল করতে চায়, তাহলে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ মুহূর্তে যদি ধর্মান্ধ মোল্লা-পীররা বাধা দান করে, তাহলে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।"

মামাজানের সাথে সাক্ষাত ও কথোপকথন

তাইমুর বেগ আমাকে মামার কাছে নিয়ে গেলো। মামা আমাকে দেখামাত্র বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মামার বয়স আশি বছর। কিন্তু দেখতে খুবই সুস্থ্য মনে হয়। লাল-সাদা মিলিয়ে আকর্ষণীয় শরীরের রং, সাদা ফকফকে চুল-দাড়ি; সব মিলিয়ে এক আকর্ষণীয় অবয়বের অধিকারী ছিলেন।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

– তোমার মায়ের কি অবস্থা? তার সাথে এখন কে আছে?

– তিন মাস আগে আমি তাঁর থেকে পৃথক হয়ে এসেছি। তখন তো জীবিত ছিলেন। তবে তাকে সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছিলো।

– নাগরিক অধিকার বঞ্চিত! সে আবার কি? এতে কি হয়?

– যারা আল্লাহ, রাসূল, জান্নাত, দোযখ, আখিরাত, আসমানী কিতাব, হাশর-নাশর, ইত্যাদির উপর বিশ্বাস রাখে, তাদেকে কমিউনিষ্টরা "রূহানী" আখ্যা দিয়েছে। আর তাদের নজরে যারা "রূহানী" প্রমাণিত হচ্ছে, তারাই সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

– আল্লাহর নিয়ামতের না শুকরীর পরিণাম হিসাবে আজ আমাদের উপর এই আযাব অবতীর্ণ হয়েছে।

এরপর মামা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাইমুর বেগকে বললেনঃ "হাজী খোকন্দীকে ডাকো।"

হাজী খোকন্দীর নাম যুল্‌দাশ। তিনি বড় শ্রেণীর পর্যটক ছিলেন। আরব, তুর্কী, ইরান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান ছাড়াও ইউরোপের বেশ কটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। আনোয়ার পাশার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বর্তমানে মামার বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামারের দেখাশুনার দায়িত্বে আছেন। হাজী খোকন্দী এলেন। তাকে তিনি বললেনঃ "জালালুদ্দীন ঈশানকে ডেকে নিয়ে এসো।" হাজী সাহেব চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এসে সংবাদ দিলেন যে, সাইয়েদ জালালুদ্দীন লংগরআতা গিয়েছেন। কাল-পরশু আসবেন।

হাজী খোকন্দী সেদিনই কারশী থেকে এসেছিলেন। সেখানে মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেন। তাঁর বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো যে, সেদিন সেখানে যে আলিমে দ্বীনকে শহীদ করা হয়েছে, তিনি বুখারার প্রসিদ্ধ মুফতী দামলা খালিমরাদ ছিলেন এবং মসজিদে মাগাক -এর খতিব তাঁরই শিষ্য ছিলেন।

পরের দিন সাইয়েদ জালালুদ্দীন ঈশান আসলেন। মামা তাঁকে বললেন ঃ সাইয়েদ! আপনি বলেন যে, স্যোশালিষ্টদের উদ্দেশ্য শুধু দীন-মজুর ও গরীব শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো, শিক্ষা ব্যাপক করা, আমদানীর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা, প্রয়োজনের অধিক জমি সরকারের অধীনে রাখা, মহিলাদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা? আর তারা সকল ধর্মের স্ব-স্ব ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং স্বাধীনভাবে প্রত্যেককে ধর্ম পালন করতে দেয়ায় বিশ্বাসী? এখনও কি আপনি তাদের ব্যাপারে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন? তাদের ব্যাপারে আপনার ধারণা আজ অবধি কি এরূপ রয়েছে?

পীর সাহেব বললেনঃ এখন প্রকৃত অবস্থা আমার সামনে জাহির হয়ে গেছে। বুঝা হয়ে গেছে যে, তাদের রসালো বয়ান-বক্তৃতা সবকিছু ধোকা ও চক্রান্ত। গাজার এ আমি স্বচক্ষে মুসলমানদেরকে হত্যা করতে দেখেছি, যেমনিভাবে হাজী খোকন্দী সাহেব শহরে সব্জে দেখেছেন। সুতরাং এখন আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের খুব বেশী একটা প্রয়োজন নেই। তবে আমি আরো কিছু স্থানে সফর করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবো।

পীর আফগানীর সফর ও ভ্রান্তির নিরসন

পীর আফগানী হযরত সাইয়েদ জালালুদ্দীন মামাজানের কাছ থেকে অত্যন্ত বিষন্ন অবস্থায় বিদায় নিলেন। এখান থেকে পুরো তুর্কিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন অঘটনের সংবাদ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে দোদুল্যমনা হয়ে পড়েছেন।

প্রায় দেড় মাস পর পীর সাহেব ফিরে এলেন। তিনি সরেজমীনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করার জন্য দীর্ঘ সফর করেন। শহরে সব্জ থেকে কিতাব, কিতাব থেকে কোহিস্তানী সমস্ত এলাকা ঘুরে দারওয়াজ পৌঁছেন, যেখানে ঐতিহাসিক আমূ দরিয়ার উৎস অবস্থিত। তারপর হিসাব, বালিসুঁ, লংগরআতা এবং গাজার হয়ে কারশী যান। যে শহর এবং যে এলাকায়ই তিনি যান, স্যোশালিষ্টদের ইসলাম দুশমনীর নতুন নতুন দাস্তান শুনতে পান। যার একটির থেকে অপরটি চরম ভয়াবহ।

কারশী থেকে বুখারা যাওয়ার ইচ্ছে করলে, কমিউনিষ্ট সরকার বাধা দান করে। সেহেতু তার বুখারা যাওয়া হয়নি। একজন লোক পাঠিয়ে বুখারার হাল অবস্থা জেনে নেন।

দেড় মাসের এই দীর্ঘ সফরে পীর আফগানীর চোখ খুলে যায়। তিনি কমিউনিষ্টদের অপপ্রচারের দরুণ একথা বুঝেছিলেন যে, কমিউনিজম কিংবা

স্যোশালিজম স্রেফ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম। ধর্মের সাথে তার কোন সংঘর্ষ নেই। বরং সেটি কেবল আল্লাহর বান্দাহদেরকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে এবং পুঁজিবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। সাইয়েদ জালালুদ্দীন ধোকাবাজির এই ধুম্রজালের শিকার হন। তাঁর কোন মুরিদ তাঁকে স্যোশালিজম ও কমিউনিজম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এই জবাবই দিতেন যে, "এটার কাজ শুধু সম্পদের বন্টনের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করা। ধর্মের সাথে এর কোন ধরনের যোগসূত্র নেই।" এখন স্বচক্ষে দেখার পর তাঁর চক্ষু খুলে যায়। স্থানে স্থানে তিনি কমিউনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের ইসলাম ও মুসলমানদের উপর নগ্ন হামলার করুণ চিত্র দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। এখন তাঁর বুঝে আসে যে, হাতি যে দাঁত দেখায়, সে দাঁতে চাবায় না। স্যোশালিজম ও কমিউনিজম নিরেট ধর্ম-বিরোধী তথা ইসলাম বিরোধী মতবাদ বৈ কিছু নয়। মার্কসবাদে খোদা ও ধর্মের চিন্তা-ভাবনা হারাম। বরং মার্কসবাদে ধর্ম আফিমের মতো মানুষকে ধ্বংস করে। এজন্য ধর্মের মুলোৎপাটন পার্টির প্রথম ফরীযা। কিন্তু কি করবেন তিনি এই মুহুর্তে। পানি মাথা থেকে অনেক নীচে গড়িয়ে পড়েছে।

কমিউনিষ্টরা তাঁর সমর্থন নিয়ে, তুর্কিস্তানের মুসলমানদের বুকে হিংস্র থাবা ইতোমধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। এখন তাঁর মাথায় স্বদেশ আফগানিস্তানের চিন্তা সওয়ার হয়েছে। ঈমান-আমল ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিধ্বংসী কমিউনিষ্টরা তাঁর সমর্থন নিয়ে আফগানিস্তানেও শিকড় মজবুত করে চলেছে। এজন্য সর্বশেষে তিনি স্বদেশ ফিরে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে দেশ ও জাতিকে কমিউনিজমের ধ্বংসাত্মকতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করাতে পারেন।

যাওয়ার পূর্ব মুহুর্তে তিনি মামার সাথে গভীর ও সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। তুর্কিস্তানের মুসলমানদের দুর্দশা-দুর্গতি এবং তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা আলোচনা করে এক পর্যায়ে তিনি বলে উঠলেনঃ "হযরত! এই মুহুর্তে হিজরত ফরযে আইন হয়ে গেছে। আপনিও সফরের প্রস্তুতি নিন এবং আমার সাথে চলুন। এতোদিন পর্যন্ত তো আপনি-আপনারা আমার আদর-যত্ন করলেন, এবার আমাদেরকে কিছু সুযোগ দিন।"

"মামা অত্যন্ত ধীর-স্থির ও গাম্ভীর্যতার সাথে পীর আফগানীর কথা শ্রবণ করলেন। এরপর মামা বললেনঃ

পীর সাহেব! তুর্কিস্তানের উলামা এবং আম-জনতা এটা পূর্ণ এরাদা করেছে যে, তারা হিজরত করবেন না। বাঁচবেন তো এখানেই বাঁচবেন; আর মরতে হয় তো এই বে-দ্বীন, খোদাদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও নাস্তি-মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই জন্মভূমিতেই মরবেন। এই দেশ আমাদের। আমরা এখানে

উড়ে আসিনি। হাজারো পীর-আউলিয়ার দেশ এই তুর্কিস্তান। এখানে মুষ্টিমেয় কমিউনিষ্ট-স্যোশালিষ্ট আজ ক্ষমতার দাপটে যাচ্ছে তা করছে, কিন্তু তৌহিদী জনতা রুখে দাঁড়ালে তাদের পালানোর সময়ও থাকবেনা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না। দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো ; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

–সূরা নিসা ঃ ৭৫।

পীর সাহেব! আজকে এই কঠিন মুহূর্তে যদি আমরা দেশবাসীর সাথে না থাকি, তাহলে কে হবে তাদের "পক্ষাবলম্বনকারী"? কে হবে তাদের "সাহায্যকারী"? সাইয়েদ আফগানী! যদি আমরা এই সংগ্রামে হেরেও যাই; তবে আমার বিশ্বাস আছে, এই পবিত্রভূমিতে কমিউনিজম বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না ; পারে না। এই পবিত্র ভূমি এদের সহ্য করতে পারে না। তবে আমরা তো প্রথমবারেই বিজয়ের আশা করি। আমরা তো আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ যারা ঈমানদার, তারা তো জিহাদ করে, আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির, তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে– (দেখবে) শয়তানের চক্রান্তই দুর্বল। –সূরা নিসা ঃ ৭৬।"

পীর আফগানী মামার হাত চেপে ধরলেন এবং কেঁদে কেঁদে বললেন; আজ থেকে আমি মুসলমান দেশসমূহকে এই ভয়াবহ ফিতনা সম্পর্কে অবগত করার কাজে বাকি জিন্দেগী উৎসর্গ করবো।

নতুন বোতলে পুরানো মদ ঃ গভীর ষড়যন্ত্র

এ কয়েকটা দিন শহরে সব্জ তাইমুর বেগের কাছেই রইলাম। পরিস্থিতি বাহ্যত স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো। লোকেরা নিশ্চিত চিত্তে নিজ নিজ কাজে লেগে গেছে। দেড়/দু'মাস পূর্বের রক্তাক্ত ঘটনাবলী মানুষের দেমাগ থেকে যেন এক রকম মুছেই গেছে। মনে হচ্ছিল যে, ইসলাম বিরোধী সেসব ঘটনা আকস্মিক ছিলো। এর পিছে সুপরিকল্পিত কোন কর্মসূচীই কাজ করেনি। স্যোশালিষ্ট সরকার মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর জন্য কয়েকজন দলীয় চরমপন্থী গুণ্ডা-মাস্তানকে কঠিন সাজাও দিয়ে দেয়। কয়েকজনকে ফাঁসি কাষ্টেও উঠায়।

সাদা দিল জনগণ এই ফাঁদে পড়ে যায়। তারা বলতে শুরু করলো, এসব হত্যাকাণ্ডের পিছে সরকারের কোন যোগসূত্র ছিলো না। যদি সরকারের কোন হাত থাকতো, তাহলে তো সরকার গুণ্ডা-পাণ্ডাদের শাস্তি দিতো না। জনগণকে ধোকা দেওয়ার জন্য তারা আরো একটি কুট-চাল চাললো। প্রত্যেক মহল্লায়, গ্রামে গঞ্জে সমাজ-সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলো। আর এ সংগঠনটির নাম রাখলো আরবীতে। 'আসহাবুল আদ্ল' এটির নামকরণ করা হলো। অর্থাৎ, "ন্যায় ও ইনসাফ প্রিয় ব্যক্তিবৃন্দ।" বাহ্যত এদের কাজ খুব ভালো ছিলো। এরা এলাকার ঝগড়া-বিবাদ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-শালিস করতো। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আপোষ-মিমাংসা করে দিতো। এভাবে তারা সাদা দিল মানুষের মনে এ কথা বদ্ধমূল করতে সক্ষম হলো যে, তারা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। জনগণের কল্যাণে তারা নিবেদিতপ্রাণ। ঝগড়া-ফাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ তারা মোটেও পছন্দ করে না। অথচ দুঃখজনক নির্ঘাত সত্য ছিলো যে, তারা এর মাধ্যমে আপামর জনসাধারণকে কমিউনিজমের ধুম্রজালে আবদ্ধ করার কুট-চক্রান্তে লিপ্ত ছিলো।

সমাজের নেতা শ্রেণীর লোকদের বাউন্ডুলে ছেলে-সন্তানেরাই এর সংগঠনের কর্মী-নেতা হলো। এরা এই সংগঠনের ছত্রছায়ায় যথেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হলো এবং গোপনে নিয়মিত সমাজের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ও দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে লাগলো। তাই লোকেরা প্রথম প্রথম এদেরকে ভালো মনে করলেও কিছুদিন পর তাদের থেকে বিলকুল দূরে সরে পড়লো।

পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে "আসহাবুল আদল"-এর সদস্যরা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রেসক্রিপশন মোতাবেক নিজ লক্ষ্য পথে দ্রুত এগিয়ে গেলো। জাতিকে তারা দ্বীনদার ও প্রগতিশীল (?) দু'ভাগে বিভক্ত করলো। এরপর তারা একটি পরিসংখ্যান চালালো যে, কারা তাদের জন্য বাধা, কারা বেশী প্রতিবাদী, কারা হাল্কা প্রতিবাদী-প্রতিরোধী, কারা অল্প চাপের মুখেই তাদের মতাদর্শ মেনে নিবে, কারা কোনক্রমেই তাদের অধীনে আসার নয়। তারা এটারও খোঁজ-খবর নিলো যে, কার সাথে কার কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। আর কিভাবে সে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়। এদের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো, উলামা-মাশায়িখদের সম্পর্কে সম্যক তথ্য রাখা। তাঁরা কোথায় কি করছেন, কোথায় কোন অবস্থানে আছেন, তার একটি পূর্ণ রিপোর্ট এরা সরকারের কাছে রীতিমতো পৌঁছালো।

"আসহাবুল আদল" অত্যন্ত পরিপাটিভাবে তাদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করলো। অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্যেকটি শহর ও এলাকার প্রত্যেকটি লোকের

রিপোর্ট তৈরি করলো এবং তা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় দফতরে জমা দিলো। উক্ত রিপোর্টে প্রত্যেকের নাম, ঠিকানা, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চিন্তাধারা, এমনকি মানসিক অবস্থার কথাও লিপিবদ্ধ করা হলো।

আস্তে আস্তে এদের আসল চেহারা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠলো। যখন এদের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়লো, তখন বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, এতো 'নতুন বোতলে পুরানো মদ'। এতো আসহাবুল আদল-নয়; বরং আসহাবুল ইলহাদ ওয়াল ইরতিদাদ– কাফির ও মুরতাদ লীগ। এরাতো চরপন্থী কমিউনিষ্টদেরই দোসর।

এই স্যোশালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের পাশে দু'শ্রেণীর লোক জমায়েত হলো। ১. উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ভট, বে-পরোয়া ও ধর্মকর্মে লাগামহীন, পার্থিব নেতৃত্বলোভী কু-শিক্ষিত শ্রেণী। ২. তথাকথিত আলিম, সুফী নামে খ্যাত বুযুর্গশ্রেণী (?), যাদের জ্ঞানশূন্যতা, অদূরদর্শিতা ও অপরিনামদর্শিতা দেখে দয়া হয়। লেনিন একবার বলেছিলো–"তোমরা প্রাচ্যে ধর্মবিরোধী মতাদর্শ বাস্তবায়ন করতে ধর্মের লেবাস ধরে মাঠে নামো; তাহলে কৃতকার্য হতে পারবে।" লেনিনের অনুসারীরা গুরুর উপদেশ বাস্তবে রূপায়িত করেছে। আর স্থানে স্থানে ধর্মের লেবাস ও সাইবোর্ডধারী নাম সর্বস্ব উলামা-মাশায়িখ তাদের হাতের খেলনা হয়ে, সেই উপদেশ বাস্তবায়নের হাতিয়ার হয়েছেন। সেই মোল্লা, মাওলানা, পীর, সুফী, দরবেশ ও বুযুর্গ নামের মোল্লাদের বাহ্যিক উজ্জ্বল চেহারা, কপালে রৌশন সিজদার দাগ দেখে সাধারণ জনতার তাদের প্রতি দুর্বল হওয়া খুব স্বাভাবিক। তারা এই বেশ ভূষায় কুরআন-হাদীসের অর্থ বিকৃত করে স্যোশালিজমের পক্ষে জোরালো ভাষণ-বক্তৃতা দেওয়ার দরুণ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে কমিউনিজমের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করায় আম-জনতা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিনতিতে প্রকৃত উলামা মাশায়িখ যাঁরা জীবনবাজি রেখে, জেল-জুলুমের ভয় উপেক্ষা করে, কুরআন-হাদীস, ইসলাম-মুসলমান ও দেশ-জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমরণ কুশেশ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের আদর্শ ও আন্দোলন বিতর্কিত হয়ে গেলো। লোক সমাজে এক পর্যায়ে এঁরা সন্ত্রাসী ও ক্ষমতালোভী (!) প্রমাণিত হলেন। এক পর্যায়ে তাঁদের অনুসারীদের মধ্যেও ভাঙ্গন সৃষ্টি হলো। ফলে মুসলমান দুটি প্লাটফরমে ভাগ হয়ে গেলো। পরিশেষে তাঁরা পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে এক প্রকার ব্যর্থতার শিকার হলেন।

এই কমিটির একটি চিত্র ইয়াকুব চরখী নামক এক গ্রামের একজন ইমাম সাহেব থেকে জানতে পারি। এই গ্রামটি শহরে সব্জ থেকে আনুমানিক ষোল

মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের লোক কেনাগাস গোত্রের অন্তর্গত। সে সময় আমরা চারজন ছাত্র শহরে সব্জের আশপাশে ভ্রমণ করছিলাম। যখন আমরা ইয়াকুব চরখীতে পৌঁছলাম, তখন ইমাম সাহেব কোন বিয়ে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। মাঝরাতের দিকে তিনি ফিরে এলেন। মসজিদেই সাক্ষাত হলো। আমাদেরকে দেখে তিনি আশ্চার্যান্বিত হলেন। বিশেষতঃ আমি হযরত খোকন্দী-এর ভাগ্নে জেনে আরো আশ্চর্য হলেন। ইমাম সাহেব তাঁর রক্তাক্ত দাস্তান শুনালেন। বললেন ঃ

আমরা তো আজকাল রক্ত অশ্রু বহাচ্ছি। এই মসজিদ ছাড়াও আরো চারটি মসজিদের আমি ইমাম। আমরা বললাম ঃ সেটি কিভাবে হয়? বললেনঃ "এখানকার মানুষ নামায পড়তে মসজিদে যায় না। শুধু বিয়ে-শাদী, কাফন-দাফন, জানাযা, নতুন ফসল কাটার পর দু'আর জন্য তাদের ইমামের প্রয়োজন হয়। আগে ফসলের মৌসুমে বেশ ফসল পাওয়া যেতো, যা দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতো। এখন কমিউনিষ্টরা ইমাম সাহেবের খোরাকীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতঃ অল্প কিছু অনুমোদন দিয়েছে। যা দিয়ে চলে না। ৪/৫টি মসজিদের বেতন দিয়েও আমার পূর্ণ মাসের খাওয়ার ব্যবস্থা হয় না। অধিকাংশ সময় উপোস থাকতে হয়।"

আমার তিনজন সাথীই পাহাড়ী লোক ছিলো। রাজনীতি, সংবাদপত্র, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা ছিলো না। এজন্য তারা আমাদের কথায় মজা পেলোনা। তারা ঘুমিয়ে পড়লো। ইমাম সহেব বললেনঃ চলো, বারান্দায় বসি। এরা আরামে ঘুমাক।

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলাম। ইমাম সাহেব বললেনঃ আমাদের এখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এলাকার উদ্ভট, বদমাআশ ও গন্ডমূর্খ গুণ্ডা-মাস্তানরা এর সদস্য। একজনও লেখা-পড়া জানেনা। আমার মাধ্যমে সব রিপোর্ট লেখিয়ে নেয়। অথচ আমি এই কমিটির সদস্য নই। হুমকি-ধমকি দিয়ে আমার দ্বারা সবকিছু লেখিয়ে নেয়। তবে ওরা বলেছে, "আপনার নাম রূহানীদের তালিকাভুক্ত করা হবে না। আর সরকারী পক্ষ থেকে আপনাকে কোন হয়রানি করা হবেনা।"

ইমাম সাহেব বললেনঃ সরকারী ছত্রছায়ায় বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও বিদ'আত চালু করা হচ্ছে। কেউ বাধা দিলে তাকে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ভণ্ড-পীর, মাজার পুজারী, ভুয়া তাবিজদাতা ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী সংগঠন সরকারী সহযোগিতায় তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দেখুন– আগে আমাদের এখানে কবরের তাওয়াফ হতোনা। এখন সরকারী ছত্রছায়ায় এটি চলছে। কেউ বাধা দিলে তাকে সন্ত্রাসী বলে আসহাবুল আদল-এর লোকেরা পুলিশের হাতে

সোপর্দ করছে। কদিন আগে এই এলাকার একজন প্রভাবশালী গুণ্ডা কবর তাওয়াফে বাধা দিলে তাকে কমিটির সামনে জবাবদিহি করতে হয়।

ইমাম সাহেব আরো বললেনঃ বেশী হলে দু'মাস হবে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি বিরাট বিরাট রেজিষ্টার পূর্ণ করে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। সবার নাম, ঠিকানা, পেশা, শিক্ষা সব লিখে দেয়া হয়েছে। উলামা-মাশায়িখ-এর তো বিশেষভাবে রিপোর্ট দেয়া হয়েছে। তাঁদের কারা অনুসারী, কারা বিরোধী এবং কিভাবে তাঁদেরকে দমন করা যাবে, তাও লিখে দেয়া হয়েছে।" মামার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বললেনঃ তার ব্যাপারে তো বিশেষ দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে। কারা তার কাছে আসছে, কারা যাচ্ছে, এসবের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

আমি বুখারা, ফারগানা, সমরকন্দে এবং কারশী ইত্যাদি শহরে যা কিছু ঘটেছে, তা তাকে শুনালাম। এক পর্যায়ে তাকে বললামঃ পীর আফগানী তো স্যোশালিষ্টদের ধোকা বুঝতে পেরে আফগানিস্তান চলে গেছেন। ইমাম সাহেব একথা শুনে খুবই তাজ্জব হয়ে বললেনঃ এটা তো কারামত ছাড়া কিছু নয়। পীর আফগানী তো গাজী আমানুল্লাহর পীরজাদা দাবী করতেন। তিনি স্যোশালিষ্টদের প্রভাবশালী সমর্থকই ছিলেন না, বরং তিনি উচ্চস্বরে একথা বলতেন যে, "অচিরেই স্যোশালিজম মানব জাতিকে পৃথিবীতেই জান্নাতে পৌঁছানোর মতো মতবাদে প্রমাণিত হবে।"

পরের দিন অত্যন্ত স্নেহ-মমতার সাথে ইমাম সাহেব আমাদেরকে বিদায় দিলেন। যখন বুখারা-সমরকন্দ তথা তুর্কিস্তানের মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিলো, যখন তারা অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত লড়াইয়ে উপণিত হয়েছিলো, তখন কমিউনিষ্টরা উলামায়ে কিরামের মাঝে মতোবিরোধের ঝড় বইয়ে দিলো। জাতির বিবেক বলে বিবেচিত উলামা-মাশায়িখ-এর বিরাট এক অংশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই মতোবিরোধের তুফানের শিকার হলেন। আর এই তুফানকে তুঙ্গে উঠাতে উলামা নামধারী এক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট দালাল সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলো। তুফানের তীব্রতা এমন ছিলো যে, উলামায়ে কিরাম বে-মালুম এর আওতায় এসে গেলেন। জুমুআর পর দুই রাক'আত ইহতিয়াতুজ জোহর পড়া যাবে কিনা? মাহফিলে মীলাদ বিদ'আত কিনা? নামাযে আত্তাহিয়্যাত-এর সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো ঠিক কিনা? হুযুর (সা)-এর ছায়া ছিলো কিনা? হুযূরে আকরাম (সা)-এর পিতা-মাতা কাফির না মুসলিম? ইত্যাকার প্রশ্নবানের তুফানে গা ভাসালেন উলামার এক শ্রেণী। কিন্তু বুদ্ধিমান, সচেতন ও প্রকৃত দেশ জাতি-প্রেমিক উলামায়ে কিরাম এসব থেকে দূরে থেকে দেশ-ধর্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। কারণ এসব বিষয় আগেও ছিলো, তখনও এ শ্রেণী

নিজেকে এসব বিষয়ে নিজেদেরকে জড়াননি। বলাবাহুল্য, কমিউনিষ্টরা উলামায়ে কিরামকে আপসে (পরস্পরে) লড়িয়ে দেয়ার চক্রান্তে, কৃতকার্য হয়েছিলো। যেসব মসজিদে নামায পড়ারও অনুমতি ছিলো না, সেসব মসজিদেও জোরে সোরে এসব বিষয়ের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠান হতে লাগলো। আর একে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ-বিদ্বেষ তথা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। ফলে উলামায়ে কিরাম ও জনতার বিরাট অংশ প্রকৃত সমস্যা ও শত্রুর মুকাবিলা করার পরিবর্তে ভিন্ন ময়দানে মশগুল রইলেন। এর ফাঁকে আসহাবুল আদল ও কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নে দ্রুত এগিয়ে গেলো।

সির আসিয়া ঃ একটি আদর্শ গ্রাম

ইমাম সাহেবের থেকে বিদায় নিয়ে দু'জন ছাত্র শহরে সব্জে চলে গেলো। আর একজন আমার সাথে থাকলো। আমরা দু'জনে সির আসিয়া শহরে পৌঁছলাম। এ শহরে নানাজান মরহুম হযরত গিয়াসুদ্দীন ঈশান (রঃ)-এর মাযার ছিলো। মাযারের জিয়ারত করে প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা পাহাড়ী পথে রওয়ানা হলাম। অসংখ্য পর্বতমালা ডিঙ্গিয়ে অসংখ্য ভয়াবহ ঘাঁটি পেরিয়ে একটি গ্রামে পৌঁছলাম। এখানের লোকেরা বিশাল আকৃতির ছিলো। তাদের ভীতিপ্রদ অবয়ব দেখলে যে কেউ প্রথমতঃ ভয় পাবে। শহর থেকে এ গ্রামটি মাত্র তিন দিনের পায়ে হাটা দূরত্বে অবস্থিত। কিন্তু তাদের আকাশ-জমীন, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, ধর্মীয়-অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো। সবার মধ্যে প্রবল ধর্মীয় জোশ-আগ্রহ দেখা যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নামাযী-দ্বীনদার, শিষ্ট ও অল্পভাষী ছিলো। সালামের বেলায় এরা অগ্রগামী ছিলো। পর্দার যথাযথ ব্যবস্থা ছিলো। দিনের বেলায় সাধারণতঃ কোন মহিলা দেখা যেতো না। কদাচিৎ দু-একজন মহিলা দেখা গেলেও তা অবশ্যই একশো ভাগ শরয়ী পর্দায় আবৃত থাকতো। মসজিদের সাথে একটি প্রশস্ত মেহমানখানা ছিলো। বাইরে থেকে কোন মুসাফির এলে এখানে অবস্থান করতো। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে মুসাফিরদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। লোকদের জীবন-জিন্দেগী খুবই সহজ-সরল। কৃত্রিমতা বলতে কিছু তাদের মধ্যে নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। ঘরে তেমন কোন আসবাব-পত্র নেই। ইমাম সাহেবই এলাকার সর্বজন স্বীকৃত মুরুব্বী। নামায পড়ানো, বিচার-শালিস করা, দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষাদান, অসুস্থ্য-পীড়িতদের সেবা-শুশ্রষা ও খোঁজ-খবর নেয়া, সবকিছুই ইমাম সাহেবের নেতৃত্বেই হয়। এককথায় পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত একটি আদর্শ পাড়া-গাঁ। পরে জানতে পারলাম যে, নানাজান গিয়াসুদ্দীন ঈশান (রহঃ)-এর হাতে গড়া গ্রাম

এটি। এখন তারা মামাজান হযরত খোকন্দী-এর তত্ত্বাবধায়নে চলে। মুজাহিদীনদের এলাকা এখান থেকে শুরু। গত দশ বছর যাবত সাম্রাজ্যবাদী কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে বাহ্যত কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হলো না। শুনলাম, কোন আক্রমণের আশংকা করলে সাথে সাথে পাশের আকাশ চুম্বী পর্বত মালার ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শত্রুর মোকাবেলা করে।

রাতে উভয়জনই মেহমানখানায় থাকলাম। এদিন এক-দেড়শো বৃদ্ধ-জোয়ান এলো। সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটির বয়স একশো'র বেশী হবে। তিনি একটি গিলাফ থেকে কতোগুলো পুরানো পৃষ্ঠা বের করলেন। প্রথমে কুরআনে কারীমের আয়াত- ان الحكم الا لله -ইনিল্ হুক্মু ইল্লা-লিল্লাহ সর্বময়-ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ; আয়াতটি পড়লেন। এরপর সূরা ফালাক, নাস পড়লেন। তারপর কালিমায়ে তাইয়িবা ও কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন। সবাই তাঁর সাথে সমস্বরে পড়লো। তারপর বৃদ্ধ লোকটি পুরানো পৃষ্ঠাগুলো থেকে পড়া শুরু করলেন। কথাগুলো তুর্কীতে লেখা ছিলো। অনেকগুলো কথা এখনও মনে আছে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার পরিচিতি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পেয়েছি। তোমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা শুধু তোমার হুকুম মানবো। তুমি ব্যতিত অন্য কারো সামনে মাথা নত করবো না। আমরা যেন মুসলমানদেরকে কষ্ট না দেই। তোমার স্বীকৃতি দানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখি। বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের যেন স্নেহ করি। একসাথে বসবাসকারীদের হকের প্রতি যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি। হালাল রিযিক যেন ভক্ষণ করি এবং হারাম রিযিক থেকে যেন সম্পূর্ণ বেঁচে থাকি। হে খোদা! আমরা তোমার রাসূলের বন্ধুকে বন্ধু, শত্রুকে শত্রু মনে করছি এবং তোমার হাতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করছি।"

এটি একটি শপথনামা ছিলো। এটি পাঠ করার সময় পুরো মেহমানখানায় চরম নীরবতা বিরাজ করছিলো। প্রত্যেক মাসের শুরুতে এটি পড়া হয়। বৃদ্ধ লোকটির এটি পড়া হলে সবাই তার সাথে মুসাফাহা করে চলে গেলো।

আশ্চর্যজনক একটি পাহাড়ী সফর

এখান থেকে আমার তৃতীয় সাথী বিদায় নিয়ে গেলো। একজন নতুন সাথী আমার সফরসঙ্গী হলো। পথে খাওয়ার জন্য ভেড়ার দুধের ঘি আর ছাতু নিয়ে যাত্রা শুরু হলো। যে পথটি দিয়ে হেটে চললাম, সে পথটি ইসলামী শাসন আমলে ব্যস্ততম মহাসড়ক ছিলো। কমিউনিষ্টরা এটিকে স্থানে স্থানে খুড়ে নষ্ট

করে দিয়েছে। এখন এর উপর ও চতুর্পার্শ্ব বিভিন্ন আগাছায় ভরে গেছে। রাস্তার পাশে পাহাড়। থেকে থেকে সুদর্শন ঝর্ণা দেখা যাচ্ছিলো। অসংখ্য ছোট ছোট নদীর স্বচ্ছ পানির ছলছল কলতান মন বিমোহিত করছিলো। রাস্তার কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের গাছ আর রং বেরংয়ের পাখ-পাখালী, আখরোট, পেস্তাসহ নানা ধরনের ফলের সমাহার ছিলো। সবকিছু মিলিয়ে যেন একটি জান্নাতী পরিবেশ।

দিনের বেলা পাখি শিকার করে পেট পুরতাম, আর যেখানেই রাত হতো, সেখানেই কাঁত হয়ে যেতাম। এভাবে চলতে চলতে ৬ষ্ঠ দিনে আসরের সময় ত্রিরাস্তার একটি মোড়ে পৌঁছলাম। একটি রাস্তা নতুন মনে হচ্ছিলো। সেই রাস্তাটি ধরে এগিয়ে চললাম। বিশ-পঁচিশ মিনিট চলার পর গভীর জঙ্গল শুরু হলো। ইত্যবসরে হঠাৎ একটি নতুন কিল্লা চোখে পড়লো। একটু পরেই জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র যুবক নজরে পড়লো। কেউ পদব্রজে কেউ ঘোর সওয়ার। দেখামাত্র আস্‌সালামু আলাইকুম বললাম। একজন যুবক খুব গম্ভীর স্বরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বললো। এর পর জিজ্ঞাসা করলোঃ

– কোত্থেকে আসা হয়েছে?

– আমি বললাম, শহরে সব্‌জ থেকে।

– আপনাকে তো শহরে সব্‌জের লোক মনে হচ্ছে না। তবে দ্বিতীয়জন সেখানের হতে পারে।

– আপনার ধারণা ঠিকই হয়েছে। আমি প্রকৃত পক্ষে ফারগানার লোক। আর আমার এ সাথী কাযীল এচমেক-এর।

– কাযীল এচমেক-এর কোন লোককে চিনেন?

– হ্যাঁ! তাইমুর বেগকে চিনি। আমি তার মেহমান ছিলাম। এরপর তার পূর্ণ ঠিকানা দিলাম। যুবকটি আমার পূর্ণ খোঁজ-খবর নেয়ার পর বললোঃ আপনি তো আমার পূর্ণ উত্তর দেননি। আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? আমি বললামঃ ঘোরাফেরা আর আল্লাহর নির্দশনাবলী দেখা। আর কিছু নয়। যুবকটির মুখে একটি অর্থবহ মুচকি হাসি খেলে গেলো। এরপর বললোঃ আচ্ছা! তাহলে আপনি কিল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে দেখতে চাচ্ছেন?

– জ্বী হ্যাঁ! যদি অনুমতি হয়, তাহলে খুব খুশী হবো। যুবকটি ইশারা করে সহকর্মীদেরকে কি যেন বলা মাত্রই সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। শুধু দু'জন আমার সাথে রইলো। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলামঃ

– আপনারা কে? যে যুবকটি আমার সাথে কথা বলছিলেন, তিনিই বা কে?

– অত্যন্ত মহব্বতের সাথে বললোঃ মান্ তুর্কী নমী দা-নাম– আমি তুর্কী ভাষা জানি না।

এদিকে আমিও ফার্সী না জানার ভান ধরে রইলাম এরই মধ্যে আমার সাথী ফার্সীতে জিজ্ঞাসা করলোঃ তুমি কোথাকার?

– (যুবকটি বললো) আমি বিলজোয়ান-এর। আনোয়ার পাশার শাহাদাতের পর থেকে আনুমানিক আট বছর ধরে আমি জঙ্গলে থাকি।

এক ঘন্টা পর যুবকটি ফিরে এলো। আমার সাথীকে বিদায় দিয়ে দিলো। আমাকে সাথে নিয়ে কিল্লার দিকে যাত্রা করলো। যখন কিল্লার গেইটে পৌঁছলাম, তখন সূর্য রক্তিম হয়ে আধোডুবো অবস্থায় ছিলো। ঢুকার পূর্বে আমার ঘোড়ার গলায় নতুন সাদা কাপড়ের একটি টুকরো বেঁধে দিলেন। মনে হয় এটি বিশেষ কোন চিহ্ন। এজন্য ভিতরে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলো না এবং কোন প্রকার বাধা দিলো না।

কিল্লার বাইরে বহুদূর পযন্ত সশস্ত্র পাহারা ছিলো। রাস্তার দু'পাশেও অত্যন্ত নিভৃতে সতর্ক পাহারা ছিলো। কিন্তু বাহ্যত কিছু বুঝা যাচ্ছিলো না। কিল্লার একটি গোপন পথে আমরা কিল্লার অভ্যন্তরে ঢুকলাম। চলতে চলতে একটি বিরাট বড় হলে ঢুকলাম। মধ্যম বয়সের শশ্রুমণ্ডিত একজন বিশাল আকৃতির মানুষ। দেখতে খুব গম্ভীর। আগে বেড়ে মুসাফাহা করলেন। অতঃপর হাল-অবস্থা জানার পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ

– তাইমুর বেগ কেমন আছেন?

– জ্বী-হ্যাঁ! এখন ভালো আছেন।

– কি অসুখ ছিলো?

– দাঁতের মাড়িতে ব্যথা ছিলো।

– বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরকম মানুষকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

হলে আনুমানিক পাঁচশো মুজাহিদীন উপস্থিত ছিলেন। সবার কাছে রাশিয়ার তৈরী থ্রী নাট থ্রী। একটি বস্তু আমাকে সবচে আশ্চর্য করেছে, তা হচ্ছে, তাদের আইন-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। আমার আসার পূর্বেই আমার আকার-আকৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পূর্ণ পরিচয় পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো। দেশে কখন কি ঘটছে, প্রতিনিয়ত তার খবরাখবর তারা রাখছেন। দেশে বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল কমিটি সংগঠনের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক ছিলো। সমরকন্দ ও অন্যান্য পাহাড়ী এলাকার যে কোন স্থানে কমিউনিষ্টদের কোন জুলুমের খবর পেলেই তারা লাফিয়ে পড়তেন জালিমদের উপর। বাস্তবিই প্রত্যেকটি মুজাহিদ এক একজন সিংহ-শাবক ছিলো।

কথায় কথায় জানা গেলো যে, এই কিল্লায় এক হাজার মুজাহিদ রয়েছেন। পর্বতমালার ওপারে আফগান সীমান্ত। কিন্তু সীমান্ত এলাকা কমিউনিষ্ট লাল

বাহিনীর দখলে ছিলো। এজন্য মুজাহিদীন লাল ফৌজ দ্বারা এক রকম বেষ্টিত ছিলেন। কিল্লার আমীরে মুজাহিদ বুখারার একটি মাদ্‌রাসার স্নাতক ছিলেন। অনেক অভিজ্ঞতা আছে তাঁর রণকৌশলে। গাজী আনোয়ার পাশার মুজাহিদ ছাউনীর নামকরা কমাণ্ডার ছিলেন। সকল মুজাহিদীন বিভিন্ন বনজ-গাছপালার ডাল-পালা দিয়ে সুন্দর সুন্দর কলম বানাতেন, যা বুখারা, সমরকন্দ এবং আফগানিস্তানের বাজারে বিক্রিত হতো। সে সময় এটিই তাঁদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিলো।

আমিরে মুজাহিদীন ফজরের নামাযের পর মুজাহিদদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথার মাঝখানে কি শব্দ যেন উচ্চারণ করলেন বুঝতে পারলাম না। সাথে সাথে মুজাহিদীন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সবাই স্যালুট করলেন। মনে হয় কোড ওয়ার্ড (Code word) ছিলো। এরপর সবাই সমস্বরে কালিমায়ে তাইয়েবা পড়লেন। শুনেছি মুজাহিদীন আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গের অঙ্গীকার পূনঃর্ব্যক্তের সময় সমস্বরে কালিমায়ে তাইয়েবা পড়েন। এরপর দস্তরখানা বিছানো হলো। ওই রাতের খানা। ঘোড়ার দুধ ও ছাতু দিয়ে তৈরী এক ধরনের খাবার। আমীর সাহেব তাঁর সাথে বসালেন। খানার মধ্যে এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এখন কি এরাদা? আমার জবাব দেয়ার পূর্বেই তিনি বলে উঠলেনঃ কারশী স্টেশনে রুশীদের সাথে আপনার ঝগড়া হয়েছিলো? আমি হয়রান হয়ে গেলাম। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন "তৌরাযাদা! এসব আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আর আমাদের পূর্ব পুরুষদের নেয়ামতের না শুকরীর ফল আমাদের উপর পতিত হয়েছে। দেখুন! এখন আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন কিনা। এরপর বললেনঃ গিলান যাবেন?

– আমি প্রিয় জন্মভূমির প্রত্যেকটি অঞ্চলে যেতে চাই ....।

পাহাড়ী সফর থেকে ফেরার পথে

পরের দিন সকালে কিল্লা থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমির সাহেব দু'জন অশ্বারোহী আমার সঙ্গী করে দিলেন। দিনভর চলতে থাকলাম। আর রাতের বেলা কোন ঝর্ণার পার্শ্বে একটু জঙ্গলের ভিতরে অবস্থান নিতাম। সারাদিন চললাম। রাত কাটানোর পর ফজরের নামাযের পরে ছাতু এবং দুধ পান করে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা তখনো কারাচার উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠছিলাম। এই পাহাড়ে লাল ফৌজ ছিলো। একবার আমরা প্রায় একটি ফৌজী ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিলাম। জলদি জলদি রাহবার অন্য পথে নিয়ে যায়।

সন্ধ্যার দিকে একটি সবুজ-শ্যামল এলাকায় উপনিত হলাম। রাহবার বললো আর মাত্র দু'ঘন্টা সফর বাকী আছে। চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম যে, যাত্রা

বিরতি করবো নাকি চলতে থাকবো। সিদ্ধান্ত হলো চলতে থাকি। চলতে থাকলাম। চাঁদনী রাত। জঙ্গলের গাছ-পালার সাথে চাঁদ যেন লুকোচুরি খেলছিলো। নীরব-নিস্তব্ধ বন-বাদাড়। ক'জন মানুষ। চলছি নিরিবিলি। কোন গাছের পাতা ঝরে পড়লেও তার শব্দ কানে পৌঁছতো।

আনুমানিক দশটায় আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম। মেহমানখানায় উঠলাম। দায়িত্বশীলদের জিজ্ঞাসা করলাম, খানা আছে? বললো– জ্বী আছে। ভুট্টার রুটি, মাটির কাপে চিনিবিহীন চা আর দুধ নিয়ে এলো। দীর্ঘ ক্ষুধার পর এ যেন খা-খা চৈত্র মাসে মুষলধারে বৃষ্টি।

মেহমানখানায় আমরা ছাড়াও আরো চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোক ছিলো। এখানের নিয়ম ছিলো, আসা মাত্র নাম, ঠিকানা ও আসার কারণ রেজিষ্টারে লিখাতে হবে। আমরা ছোট্ট একটি কাগজে লিখে ভিতরে পাঠালাম। কিছুক্ষণ পর গম্ভীর ও মায়াবী চেহারার একজন বৃদ্ধ লোক বেরিয়ে এলেন। অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত। মনে হচ্ছিলো যেন তিনি এখন যুদ্ধের ময়দানে আছেন। প্রত্যেকটি মেহমানের সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত করলেন। সবশেষে আমার কাছে আসলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অতঃপর ভিতরের কামরায় নিয়ে গেলেন। এটি শাইখের ইবাদাতখানা ছিলো। কিন্তু এটি রুশী অস্ত্রে-শস্ত্রে ভরপুর ছিলো। রাইফেল, পিস্তল, বারুদ, বর্শা, তরবারি, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের অস্ত্রপাতি মওজুদ ছিলো। পাশে রং করা একটি চামড়া ও একটি বালিশ একটি চৌকির উপর রাখা ছিলো। শাইখের কাছে কোন বিদেশী মেহমান ছিলো। তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেনঃ এই যুবক খোকন্দী হযরতের ভাগ্নে। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক তার সফর কাহিনী।

শাইখ আমার কাছে ফারগানার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি গত তিন মাসে সমরকন্দ, বুখারা, কারশী, শহরে সব্জ ইত্যাদি শহরে যা কিছু দেখেছি, যথাসাধ্য বর্ণনা দিলাম। এই দুই বুযুর্গ একেবারে চুপচাপ আমার কথা শুনছিলেন। তারপর বিদেশী বুযুর্গ লোকটি বললেনঃ "আয্ মাস্ত্ কে বর্ মাস্ত্" এসব কিছু আমাদের কৃতকর্মের ফল। আমাদের কৃতকর্মের সাজা হিসাবেই কুফর ও ইলহাদের এই তমাশাচ্ছন্ন কালোমেঘ আমাদের মাথার উপর উপনিত। বিপদ ও মুসীবতের রাত আজ আমাদের মাঝে বিরাজামন। জানিনা সকাল কবে হবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, আমাদের পাপের সাজা ভোগ করতেই হবে।"

বিদেশী বুযুর্গ নিরাশা প্রকাশ করলেন এবং ব্যর্থ চেষ্টা না করে হিজরত করে আফগানিস্তান অথবা অন্যকোন মুসলিম দেশে চলে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বেঁচে

থাকার পথ বেছে নেয়াকেই বুদ্ধিমানের কথা বলে ব্যক্ত করলেন। শাইখ বললেনঃ হযরত মাওলানা! শুধু আমার কিংবা মুষ্টিমেয় মুজাহিদীনের আরাম ও সুখ-শান্তির প্রশ্ন নয়। বরং গোটা তুর্কীস্তানী মুসলমানদের ঈমান-আমলও অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রশ্ন গোটা তুর্কিস্তানবাসীর আজ পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। আজকের সংগ্রাম ঈমান বাঁচানোর সংগ্রাম, আজকের সংগ্রাম দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বিধানের সংগ্রাম। আজকের সংগ্রাম আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। উলামায়ে কিরাম শপথ নিয়েছে যে, তাঁরা দেশের মুসলমানদেরকে একাকী ফেলে কোথাও হিজরত করবেনা। আমাদের সংগ্রাম চলবে। বুকে এক ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এ সংগ্রাম চলবে। যতোদিন আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত না হবে, মুসলমানদের ঈমান-আমল ও মান-ইজ্জতের একশো ভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত না হবে, ততোদিন আমরা ক্ষান্ত হবো না; আমরা শান্ত হবো না। যদি আমাদের হায়াতে না কুলায় কিংবা আমরা শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমাদের সন্তান-সন্তুতি ও পূর্বসূরীদেরকে এই সংগ্রাম চালিয়ে নেওয়ার জন্য অসীয়ত করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা কোন্ দেশে হিজরত করবো। আজকের মুসলমানদের ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে। মুজাহিদীনের মজলিসে শূরা ইরান, আফগানিস্তান, আরব, তুর্কী এমনকি হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট মুসলমান দলদের কাছে সাহায্য-সহায়তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ; কিন্তু কোন দেশের মুসলমানই ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমবেদনা স্বরূপ কোন সাড়া দেয়নি। আমরা পরিশেষে তাঁদের কাছে এতোটুকু অনুরোধ করেছি যে, অন্ততঃ এই স্যোশালিষ্ট জালিম শাহীর জুলুম ও মুজাহিদীনে কিরামের জিহাদের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরুন। কিন্তু তাঁরা এতোটুকু কাজও করেননি। আমাদের অনুরোধ জনমানবহীন অরণ্যে রোদনের মতো বৃথা প্রমাণিত হয়েছে। এখন বলুন এমন কোন মুসলমান দেশ আছে, যাদের সহায়তা আমরা পেতে পারি। আরো দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব মুসলিম দেশের অনেক নেতাই স্যোশালিষ্ট বিপ্লবের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাদের পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সেন্টারগুলো মুজাহিদীনে কিরামের জিহাদকে সন্ত্রাস ও তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে অপপ্রচার করে চলেছে। এদিকে যাঁরা সেসব মুসলিম দেশে হিজরত করে গেছেন, তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। খোদ বুখারার আমীরও নজরবন্দী অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন। এই মুহুর্তে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া আমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। কেবলমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করছি।”

এসব কথা বলার পর শাইখ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, বিদেশী বুযুর্গ কাঁদতেছিলেন। কামরায় নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছিলো। আর তা দীর্ঘক্ষণ বিরাজ করলো।

ভিন্ন অবস্থায় জুমু'আ আদায়

পরের দিন শুক্রবার ছিলো। জুমু'আর নামায মুজাহিদীনের সাথে পড়লাম। আনুমানিক দু'হাজার মুজাহিদ ছিলো। মুজাহিদদের শাইখ যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। একেবারে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত। তাঁকে দেখে ইসলামের সোনালী যুগের মুসলিম সিপাহসালারদের কথা মনে পড়লো। এক কাঁধে দু'নালি পিস্তল, আর এক পার্শ্বে খঞ্জর, বুকে গুলির ফিতা, আর একটি থ্রীনাট থ্রী রাইফেল। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার প্রতিকৃতি ছিলেন। খুব ধীর-স্থির মিম্বরের দিকে এগিয়ে এলেন। রাইফেলের উপর ভর দিয়ে খুতবা দিলেন। জোশ-গাম্ভীর্যতা উভয়টিই খুতবায় ছিলো। চিন্তা-ভাবনার প্রতি আহবান, আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গের প্রতি উৎসাহ দান, নৈরাশ্য ও অস্থিরতা বর্জন-এর নসীহতপূর্ণ খুতবা হৃদয়ের মাঝে এক অপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি করেছিলো। এ ধরনের খুতবা আমি জীবনে দ্বিতীয়টি শুনিনি। সালাম ফিরিয়ে দেখি পিছনে অসংখ্য মুজাহিদীন সশস্ত্র পাহারারত অবস্থায় পিছনে দণ্ডায়মান। শাইখুল মুজাহিদীনের কাছে দরখাস্ত করে কয়েকদিন মুজাহিদীনের সাথে থাকার অনুমতি নিলাম।

শাইখুল মুজাহিদীন একটি রুমাল আমাকে হাদিয়া দিলেন এবং একজন মুজাহিদ আমার সঙ্গী করে দিলেন। যেখানেই যেতাম, রুমালটি দেখামাত্র মুজাহিদীনে কিরাম খুবই ইজ্জত করতেন। মসজিদের ছাদের উপর কয়েকজন মুজাহিদ দূরদর্শন যন্ত্র নিয়ে সর্বক্ষণ চতুর্দিকে লোকজনের গমনাগমনের খবরা খবর রাখতেন। এমনিভাবে বড় বড় পাহাড়সমূহেও মুজাহিদীনে কিরাম পজিশন অবস্থায় ছিলেন। যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাঁদের কাছে উন্নত নেটওয়ার্ক ছিলো। এর জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র ছিলো। তাখ্‌তা কারাচা এবং লংগরাতা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মারকায ছিলো। মুজাহিদীনে কিরাম ষোল মাইল অন্তর অন্তর চৌকি বানিয়ে রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট দূতেরা এক চৌকি থেকে অপর চৌকিতে খবরাখবর সরবরাহ করতো। এভাবে সমরকন্দের সন্ধার কোন খবর সকাল নাগাদ এখানে পৌঁছে যেতো। লংরাতা মারকায থেকে বুখারা পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিলো নির্দিষ্ট শ্রেণীর রাখাল ও ডাল ব্যবসায়ীর উপর।

আনুমানিক পৌনে এক ঘন্টা এভাবে ঘোরাফেরা করার পর মসজিদের দিকে এলাম। এসে দেখি সমজিদে দু'আ হচ্ছে। এই মজলিসে গত রাতের

কথোপকথন আলোচিত হয়। মজলিসে শুরার সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে হিজরত না করে দেশেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মিটিং শেষে তাই দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য দু'আ হচ্ছিলো।

সন্ধ্যা হচ্ছিল। সূর্য ডুবে যাওয়ার ব্যর্থতার দরুণ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। তার লালিমায় পশ্চিমাকাশও লাল হয়ে গেছে। ইত্যবসরে মুজাহিদদের গীলানের মারকাযে হৈ চৈ পড়ে গেলো। কি হলো! না; অন্য কিছু নয়; শাইখুল মুজাহিদীনের এক ছেলে ইসামুদ্দীন জার'আ যিনি আনুমানিক তিন মাস ধরে লা-পাত্তা হয়েছিলেন, তিনি এসেছেন। ইসামুদ্দীন বড় মাপের আরবী, ফারসী ও তুর্কী সাহিত্যিক। বড় মাপের একজন আলিমও বটে। তাসকন্দে আধুনিক শিক্ষাও অর্জন করেন। তিনি নির্ভীকভাবে রুশী জালিমদের জুলুমের জবাব কলম, বক্তৃতা ও অস্ত্রের মাধ্যমে দিতেন। মরহুম আনোয়ার পাশা যেসব তুর্কিস্তানী যুবকের উপর ভরসা করেছিলেন, ইসামুদ্দীন তাদের অন্যতম। ফৌজি ট্রেনিং খোদ আনোয়ার পাশার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। বুখারার গণহত্যার সময় তিনি সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর কারশীর গণহত্যায় একজন বিশিষ্ট আলিমকে গুলি করে মারার সময়ও তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরে যে হাঙ্গামা হলো এবং রুশী ফৌজের সাথে যুদ্ধ হলো, তাতে তিনিই নেতৃত্ব দেন। এরপর বালাউন যান। সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু খোদার ফজলে তিনি জেল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। জেল থেকে বের হয়ে আফগানিস্তানে হিজরত করেন। এবং সেখানকার সরকার ও জনগণের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন যে, এখানে হিজরত করা যাবে কিনা। কিংবা এরা আমাদেরকে কতোটুকু সহায়তা দিবে। প্রথমে তিনি আফগানীদের উপর বেশ আশাবাদী হন। পরে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর তাদের উপর আস্থাহীন হয়ে পরিশেষে দেশে ফিরে আসেন। যা কিছু তিনি দেখেন, সবকিছু বাবাজানের কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন ঃ আফগান সরকার হুকুম জারি করেছে যে, কাউকে আশ্রয় দেয়া হবে না। মাজার শরীফের গভর্ণর রুশীদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। রুশরা যা বলে, তা পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। দরিয়া পার হয়ে যারা হিজরত করে আসেন, তাদেরকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে রুশ-সরকারের হাতে হস্তান্তর করে। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মুহাজিরকে রুশী সৈন্যের হাতে তুলে দিয়েছে। বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিনিময়ে মোটা অংকের টাকাও তারা নিয়েছে। ইসামুদ্দীন একটি হৃদয় বিদারক ঘটনাও শুনালো। ইবরাহীম বেগ নামে একজন বড় মুজাহিদ কমাণ্ডার ছিলেন। বেশ কিছুদিন যাবত তিনি পাহাড়ী ঘাঁটি থেকে রুশীদের উপর হামলা পরিচালনা করেন। এক পর্যায়ে রুশী ফৌজ তাকে ঘিরে ফেলে এবং

তুমুল লড়াই শুরু হয়। ইবরাহীম বেগ তার মুজাহিদদের নিয়ে রুশী সৈন্যের বেষ্টনী ভেদ করে আমু দরিয়া পার হয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আফগানীরা তাদেরকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সবাইকে গ্রেফতার করে রুশ সরকারের হাতে তুলে দেয়।

আফগানিস্তানে বিশ লাখেরও অধিক তুর্কামান, বেগ ও তাজিক মুহাজির থাকে। এরা পশমী ভেড়া প্রতিপালন করে তা দ্বারা পশমী বস্ত্র তৈরী করতঃ জীবন-যাপন করে। এই মুহাজিরদের লিডারকেও গ্রেফতার করতঃ কাবুলে বন্দী রাখা হয়েছে এবং তিনি যেন কোন ধরনের রুশ বিরোধী সংগ্রাম না করতে পারেন, তার প্রতি কড়া নজর রাখা হয়েছে। ইসামুদ্দীন হিন্দুস্তানেরও দ্বীনী ও রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় দিন ইশার পর শাইখুল মুজাহিদীন মজলিসে শূরার মিটিং ডাকেন। আমিও তাতে শরীক হলাম। এ সময় নিয়ম ছিলো, ইশার নামায দেরিতে দেয়া হতো। এতে সবাই জমা হয়ে যেতো। এদিনও দেরিতে আযান দেয়া হলো। বিরাট গণজমায়েত হলো। নামাযের পর শাইখ বিরাট গণজমায়েতের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা দান কালে শাইখের এক কাঁধে রাইফেল আর এক কাঁধে তরবারি ছিলো। শাইখ নবীদের দাওয়াতের ইতিহাস বয়ান করলেন। অতঃপর নবীজী (সাঃ)-এর দাওয়াতের কাজে বাধা ও প্রতিরোধের বর্ণনা দিলেন। তুর্কিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেন। সাথে সাথে এখানের মুজাহিদদের বিভিন্ন অপারেশনের ঘটনা তুলে ধরলেন। ইসামুদ্দীন যা কিছু বলেছেন, তারও সারকথা বর্ণনা করলেন। এরপর শাইখ বললেনঃ "এখন আপনারা বলুন কি করবেন। পরিস্থিতি সবকিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো। হিজরত করবেন, নাকি জানবাজি রেখে লড়ে যাবেন?"

এমনিতে রাত গভীর ছিলো। একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ। শাইখ চুপ হয়ে যাওয়ায় আরো নীরবতা ছেয়ে গেলো। ইত্যবসরে একজন যুবক গর্জে উঠলোঃ "আমরা যখন এই পাহাড়ে এসেছিলাম, তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই এসেছিলাম। বেশ কয়েক বছর পরিস্থিতি ও প্রতিকার পদ্ধতি চিন্তা-ভাবনা করেই এ পথ বেছে নিয়েছি। এরপর আপনার হাতে বাইআত হয়েছি। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এই স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো– ইনশাআল্লাহ।

আমরা হিজরতও করবো না এবং কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও আন্দোলন করবো না। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কোন শরয়ী পদ্ধতি নয়। এর অনেক কিছুই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। আমরা তো কেবল দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া ও জিহাদ এই চারটি পদ্ধতির সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বীন কায়িম করার নমূনা

নবীজী (সঃ)-এর থেকে পেয়েছি। যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জুলুম ও শিরক প্রতিরোধ তথা 'খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার ফলপ্রসু পদ্ধতি হতো, তাহলে সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সরদারে দু' জাহান অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বীন কায়িমের প্রতি রাহনুমায়ী করতেন। তবে সমকালীন উলামা-মুফতিয়ানে কিরাম এটিকে জায়িয বলেন এবং কোন কোন মুসলিম দেশের উলামা-মাশায়িখ এ পদ্ধতিতে দ্বীন কায়িমের চেষ্টা-কুশেশ করছেন, সেটি ভিন্ন কথা। বর্তমানে জাওয়ায-এর ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। তবে এটি ফলপ্রসু পদ্ধতি বলে আমরা মানিনা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দ্বীন কায়িমের চেষ্টা-কুশেশকেও আমরা পছন্দ করিনা।

বন্ধুরা! কোন দেশে হিজরত করার পরিস্থিতি আছে কিনা তা ইসামুদ্দীনের মাধ্যমে বুঝা গেলো। আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা যদি ক্ষমতায় যাওয়ার চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেও যাই– অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করি, তাহলে পশ্চিমা শক্তি ও তাদের দোসররা তা মেনে নিবে না।

বলাবাহুল্য, যদি তারা প্রাথমিকভাবে মেনেও নেয়; কিন্তু পরক্ষণে তা স্থিতিশীল হতে দিবে না। আরো কয়েকজন মুজাহিদ তার সমর্থনে গর্জে উঠলো। অতঃপর শাইখ জমায়েতকে সম্বোধন করে বললেনঃ আপনাদের এই ভাইদের রায়ের সাথে আপনারা সবাই একমত রয়েছেন? সবাই সমস্বরে চেচিয়ে উঠলো, হ্যাঁ, একমত আছি।

শাইখ অত্যন্ত খুশী হলেন। দ্বিতীয়বার খুতবা পড়লেন। তারপর জিকির শুরু করলেন। সবশেষে কালিমায়ে তাইয়িবা পড়ে পুনরায় সবার থেকে অঙ্গীকার নিয়ে মজলিস খতম করলেন।

আমি শাইখের সাথে এলাম। শাইখ বললেনঃ তৌরাযাদা! এখন ঈমানদারদের সামনে দু'টি পথ উন্মুক্ত রয়েছে। ১. কুফর ও ইলহাদের উপর রাজি হয়ে ধর্মহীন বেপরোয়া জীবন যাপন করা। ২. দ্বীন-ইসলামের হিফাজতে ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ করা। তবে তৃতীয় একটি রাস্তা আছে; সেটি হলো হিজরতের রাস্তা। কিন্তু কোথায় হিজরত করবো! আফগানিস্তান-হিন্দুস্তানের অবস্থা শুনতেই পেলে। এই বিচিত্র পৃথিবীর বিশাল ক্ষেত্র কোনদিন সংকীর্ণ হয়নি। আজ তা যেন তুর্কিস্তানী মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে গেছে। একথা বলে শাইখ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

ক্যাম্প পাহারার সুষ্ঠু বন্দোবস্তো ছিলো। তাহাজ্জুদ নামাযের পর আজকে পাহারার দায়িত্ব শাইখের উপর ছিলো। দু'ঘন্টা পর্যন্ত আমিও শাইখের সাথে থাকলাম। শাইখ অনেক কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে শাইখ বললেনঃ এই

সংগঠনে শুধু পুরুষ মুজাহিদ নয় ; মহিলা মুজাহিদও রয়েছে। মহিলাদেরকেও রীতিমতো ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। দুশমনরা হামলা করলে মহিলারা বোঝা না হয়ে কমপক্ষে আত্মরক্ষা করতে পারবে-ইনশাআল্লাহ।

সফরের মোড় অন্যদিকে

চতুর্থ দিন শাইখুল মুজাহিদীন থেকে বিদায় নিলাম। শাইখ দশজন ঘোর সওয়ার আমার সঙ্গী করে দিলেন। একাধারে ছয়দিন আমরা শত্রুর নাকের ডগার পাশ দিয়ে লুকোচুরি করে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড় ডিংগিয়ে এগিয়ে চললাম। সপ্তম দিন কানিয়ার কাসলাক নামক স্থানের নিকটবর্তী উপণিত হলাম। এখান থেকে তুর্কিস্তানের প্রসিদ্ধ পাহাড় তারবুজ শুরু হয়। এর ওপারে সমরকন্দ শহর অবস্থিত। শহরে সব্‌জও এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ঘোর সরওয়ার সাথীরা সবাই ফিরে গেলো। আমি পোষাক পাল্টিয়ে ফেললাম। এক গাধাওয়ালার রাখালের চাকরী নিলাম, যিনি এক হাজারের মতো গাধা নিয়ে সমরকন্দ যাচ্ছিলেন। সমরকন্দ পৌঁছে একটি জেনারেল ষ্টোরে তরমুজের বিনিময়ে কিছু কাপড় কিনতে চাইলাম। দোকানের ম্যানেজার এতে রাজি হলেও কাপড় পরের দিন আটটা বাজে দিতে চাইলো। কারণ স্বরূপ বললো, আজ আফারসিয়াব-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে। সেখানে সবার উপস্থিতি আবশ্যক। গাধাওয়ালা গাধাগুলো একটি খোলা স্থানে বাঁধার ব্যবস্থা করলো। আমি এক রাতের ছুটি নিলাম এবং সোজা মাইমুন কাসলাস চলে গেলাম। তিন মাসে এখানে অনেক কিছুই উল্টেপাল্টে গেছে। পরিস্থিতি একেবারে নাজুক হয়ে গেছে। যোহরের নামাযে দু/চারজন মুসল্লী দেখলাম। তাও খুব ভীত-সন্ত্রস্ত মনে হলো। চুপে চুপে দামলা বুখারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম। লোকেরা বললো আনুমানিক এক মাস আগে কমিউনিষ্টরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে কেউ জানে না। তবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ফারগানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু জনগণের ধারণা হলো, হয়তো তাঁকে সাইবেরিয়ায় দেশান্তর করা হয়েছে। অথবা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

মাইমুন কাসলাক থেকে শাহ্‌জিন্দায় গেলাম। এখানে একটি পুরানো বাড়িতে কারী গফুরজান (আব্দুল গফুর) থাকতো। গফুরজান আমার বাল্যবন্ধু ছিলো। সে আমার প্রতিবেশীও বটে। অত্যন্ত সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতো। সাত কিরাআতে কুরআন পড়তে জানতো। যখন কুরআন তিলাওয়াত করতো, শ্রবণকারীরা যারপর নাই বিমুগ্ধ হতো। তিনমাস পূর্বে যখন এখানে এসেছিলাম, তখন সেই পুরানো শহরে সব্‌জ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলো। দামলা

বুখারীর সাথে সাক্ষাত করায়। কমিউনিষ্ঠরা এই গফুরজানকে দু'মাস যাবত নজরবন্দী করে রেখেছে। আরো শুনলাম যে, শাহজিন্দার মাজার পূরাকীর্তি হিসাবে কমিউনিষ্টরা এখন নিজ করায়ত্তে রেখেছে। লোকেরা আফরাসিয়াবের দিকে যাওয়ায় ব্যতিব্যস্ত ছিলো।

লোকদের চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছিলো যে, তারা নাখাস্তা দিলে ও জুলুমের শিকার হওয়ার ভয়ে যাচ্ছিলো। আমিও তাদের সহযাত্রী হলাম। ফৌজি, কমিউনিষ্টদের যুবনেতা ও কেন্দ্রীয় নেতাসহ মুহূর্তের মধ্যে লোকে লোকারণ্য।

জলসা শুরু হলো। একজন চরমপন্থী কমিউনিষ্টের দ্বীন-ইসলামের প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বক্তৃতা শুরু হলো। এরপর তিনটি পুত্তলিকা আনা হলো। এর মধ্যে একটি উলঙ্গ প্রায়। শুধু একটি লেংটী পড়া ছিলো। যখন এই পুত্তলিকাটি আনা হলো, তখন কমিউনিষ্টরা এর উপর অসংখ্য ফুলের মালা দিলো। তারপর এটি একটি উঁচু স্থানে রাখা হলো। অপর দুটি পুত্তলিকা পুড়িয়ে ফেলা হলো।

একজন বক্তা দাঁড়ালো এবং রুশী ভাষায় পুড়িয়ে ফেলা পুত্তলিকা দু'টি সম্পর্কে বললোঃ "এরা দু'জন হিন্দুস্তানের ইংরেজ সাম্রাজ্যের দালাল। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিষ্ফল করার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যুরো এদের দ্বারা কাজ নেয়। এরা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে। এদেরকে আলী ভ্রাতা বলা হয়।

এরপর উলঙ্গপ্রায় পুত্তলিকাটির পরিচয় এভাবে করানো হলো, ইনি হিন্দুস্তানের আযাদী আন্দোলনের দীপ্ত, মশাল। তার দাবি হলো– হিন্দুস্তানে শুধু একটি জাতি বসবাস করবো। আর সেটি হলো হিন্দু। ইংরেজদের থেকে স্বাধীন হওয়া তার জীবনের উদ্দেশ্য। তাকে মহাত্মগান্ধী বলে। ইনি এজন্য উলঙ্গপ্রায় থাকেন যে, তার জাতি আজ গোলাম। তার বক্তব্য হলো, যতোদিন তার জাতি ভূকা-নাংগা ও ইংরেজদের গোলাম থাকবে, ততোদিন সেও ভূকা-নাংগা ও গোলামের মতো জীবন-যাপন করবে। এই লোকটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের এজেন্ট এবং গুপ্ত-চরদের চরম বিরোধী। যাদের অধিকাংশ মুসলমান জমিদার, জায়গীরদার ও পুঁজিপতি।"

যেহেতু লোকেরা কমিউনিষ্টদের মিথ্যাচারিতা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, তাই তারা কোন প্রতিবাদ করলো না। রাষ্ট্রীয় দালালদের শ্লোগানের মধ্য দিয়ে জলসা শেষ হলো। (সোয়া বছর পর যখন আফগানিস্তানের পথে লাহোর পৌঁছলাম, তখন প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ)-এর কাছে পূর্ণ ঘটনা ফারসীতে শুনলাম। আল্লামা ইকবাল (রহঃ) মাওলানা জফর আলী খান,

সাইয়েদ হাবীব ও অন্য একজন মাওলানাকে যার নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছেনা; ডাকলেন। এরপর আমাকে বললেন, তাঁদেরকে সেই ঘটনাটি পুনরায় শুনাও)।

আফরাসিয়াব থেকে আমি আপনস্থলে অর্থাৎ, গাধা রাখার স্থলে চলে গেলাম। সর্দারজ্বীকে ক্বারী গফুর জানের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা ও দামলা বুখারীর গুম হয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনালাম। তিনি চুপচাপ সবকথা শুনে গেলেন। দু'দিন পরে আমরা শহরে সব্জে গেলাম। রাস্তায় সর্দার জ্বী অর্থাৎ গাধা ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ চাচা মিয়া! এই কমিউনিষ্ট আর স্যোশালিষ্ট কারা? এদের পরিচয় কি?

চাচা ঃ আরে সো তক্ বালা- বুদ্ধু ছেলে! তুমি ফারগানার অধিবাসী এবং সেসব লোকের সন্তান, যারা ইতিহাস রচনা করেছেন। যাদের প্রতি আনোয়ার পাশার মতো ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা দীর্ঘ দশ বছর যাবত বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জিইয়ে রেখেছেন।

তুমি এতোটুকুও জানোনা যে, এরা কারা? কমিউনিষ্ট আল্লাহর অস্বীকৃতিকারী। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে তারা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। আর স্যোশালিষ্টরা জমি-জমা সবকিছুর মধ্যে সরকারের অংশীদারী প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বুদ্ধুবখশ্ কিছু বুঝো, নাকি বোকার সাগরে বাস করো?

আমি বললাম ঃ চাচা আপনারা তো বন-বাদাড়ে থাকেন, এতোকিছু আপনারা কিভাবে জানেন! সরদার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এবং উত্তর দেয়ার পরিবর্তে নিশ্চুপ রইলেন। হতে পারে আমার প্রশ্ন তাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সে আমাকে যুব-কমিউনিষ্ট মনে করছিলেন মনে হয়। তাই আমি পরক্ষণেই তার এই সন্দেহ দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

চলতে থাকলাম। পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে একটি সুদর্শন ঝর্ণার কাছে উপনিত হলাম। সূর্য ডুবছিলো। ঝর্ণার কাছে পৌঁছে গাধাগুলো থামালাম। সব গাধাগুলোকে পানি পান করালাম। মশকগুলো পুরে নিলাম। উজু করলাম। তারপর মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। সরদার খুবই মধুর সূরে কিরাআত পড়লেন। পাহাড়-পর্বত ও পশু-পক্ষী সব যেন তার সেই সূরে মত্ত হয়ে গেছে। নামাযের পর খানা খেলাম। ইশার টাইম হলো। ইশার নামায পড়লাম। কাফেলা মনযিলের দিকে এগিয়ে চললো। দ্বিতীয় দিন শহরে সবজের শহরতলীতে পৌঁছলাম। এখন কাফেলা থেকে পৃথক হওয়ার সময় এসেছে। সুতরাং আর দেরি করলাম না। সরদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরে সব্জের দিকে রওয়ানা হলাম।

আবারো সির আসিয়া এলাম

যখন সির আসিয়া পৌঁছলাম, তখন সূর্য ডুবতেছিলো। প্রথমে নানাজান গিয়াসুদ্দীন ঈশান (রহঃ)-এর মাজারে পৌঁছলাম। শাইখের মাজারটি শহর থেকে একটু বাইরে আধা একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। কবরটি কাঁচা ছিলো। পশ্চিম দিকে তিনদিকে দেয়াল বিহীন একটি বড় হলরুম ছিলো। যাতে দু/আড়াই হাজার মানুষ বসতে পারে। রাত সেই হলরুমে যিকির-তিলাওয়াত ইত্যাদিতে কাটিয়ে দিলাম। সাহরীর মুহূর্তে শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। ফজরের নামায শহরের মসজিদে পড়লাম।

সির আসিয়ায় মামাজানের কয়েকটি বিশাল বাগান ছিলো। এসব বাগানে কমলা, আপেল, আখরোট, আঙ্গুর, ডালিমসহ বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদির গাছ ছিলো। পরিচিত লোক খোঁজার জন্য একটি বাগানে ঢুকে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে দুপুরের পর মামাজানের একজন খাদিমের সাথে সাক্ষাত হলো। অত্যন্ত হাস্যোজ্জল মুখে কথাবার্তা বললো। তবে একটু পেরেশান বলে মনে হলো। তাই এক পর্যায়ে বললাম ঃ খায়র বাশদ ?- ভালো আছেন? খাদিম এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললো ঃ

লাল ফৌজ গতরাতে দু'টার দিকে খোকন্দী হযরতের কিল্লা ঘেরাও করে ফেলেছে। সাতত্রিশ দিনপর এটি দ্বিতীয়বার ঘেরাও।"

– জিজ্ঞাসা করলাম, ইসাম খান (মামাতো ভাই) কেমন আছেন?

– ভালো আছে।

– তার সাথে সাক্ষাত করতে পারি?

– সময় সুযোগ হলে অবশ্যই সংবাদ দিবো।

একথা বলে খাদিম চলে গেলো। আসরের নামাযের সময় ছিলো। আসর গেলো, মাগরিব গেলো, ইশা গেলো, পরের দিন পুরোটাই গেলো। আল্লাহ, আল্লাহ করতে করতে মুখে ফ্যানা এসে গেলো। অবশেষে রাত একটা বাজে ইসামখান ও তাইমুর বেগ এলো। অনেকক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথা-বার্তা হলো। আমার সফরনামা ইসামখানকে শুনালাম। খোকন্দী হযরতের সাথে সাক্ষাতের প্রসংগ আসলে ইসামখান বললোঃ সাক্ষাত এই মুহূর্তে অসম্ভব। কারণ কাউকেই সাক্ষাত করতে দেয়া হচ্ছেনা। এরপর সে একটি দুঃখজনক ঘটনা শুনালো ঃ

গত সপ্তাহে খোকন্দী হযরতের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য লোক এসেছিলেন। তিনি বলেন, জিপিও (রাশিয়ার সিআইডি পুলিশ) ষ্টালিনের নির্দেশে তাতারী, তুর্কিস্তানী এবং ককেশাশের সমস্ত উলামায়ে কিরামকে জমায়েত করে।

তারপর তাদের সামনে একটি কাগজ রাখা হয়। সেটিতে লিখা ছিলো যে, "আমরা দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, কয়েকযুগ পূর্বে আরবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করেন এবং স্বীয় দেশ-জাতির ইসলাহ করেন। আর বর্তমান এই ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে লেনিন আসেন। তিনি মানব জাতিকে জুলুম থেকে মুক্তি দেন। আমরা আরো ঘোষণা দিচ্ছি যে, লেনিন যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু লিখেছেন, এখন সেটিই ইসলাম এবং মুসলমানদের সেটিরই অনুসরণ করতে হবে।"

জিপিও-এর সদস্যরা উলামায়ে কিরামকে উক্ত কাগজে দস্তখত করতে বলে। কিন্তু শংকাহীন, নির্ভীক উলামায়ে কিরামের একজনও উক্ত কাগজে দস্তখত করেননি। বরং তাঁরা সবাই নির্ভীক চিত্তে বলেনঃ চে-নিস্‌বত্‌ খাক্‌রা– বা আলমে পাক – মর্তের জগতের মৃত্তিকার সাথে পূত-পবিত্র উর্ধ্বজগতের সাথে কি সম্পর্ক? কার্লমার্কস ও লেনিন নিছক বস্তুবাদী এক একজন সাধারণ মানুষ ছিলো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণ্যময় মহান শিক্ষার সাথে লেনিন, কার্লমার্কসের বস্তুবাদী ও বিবেকপ্রসূত শিক্ষার কোন তুলনাই হতে পারে না। উলামায়ে কিরামের এই বিরোচিত আচরণে কমিউনিষ্ট সৈন্যরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। পরিণতিতে তারা জমায়েতে উপস্থিত উলামায়ে কিরাম ছাড়া আরো– অসংখ্য উলামায়ে কিরামকে গ্রেফতার করলো। এঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় তিরানব্বই জনকে বাদ দিয়ে বাকিদেরকে সাইবেরিয়ায় দেশান্তর করা হলো। আর বাকি তিরানব্বইজনকে গাড়ীতে করে ঊষ শহরের কাছে পর্বতমালায় নিয়ে যাওয়া হলো। সবাইকে এক বস্তা ছোলা এবং একটি কোদাল দেয়া হলো। এরপর পাহাড়ের পাদদেশে একজন আলিমকে দুই ফুট গভীর পাঁচ ফুট লম্বা, একটি গর্ত খুরতে বলা হলো। মাওলানা গর্ত খুরলেন। এরপর সেই গর্তে নামতে বলা হলো। আর মাওলানা গর্তে নামা মাত্রই বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করা হলো। এভাবে সমস্ত আলিমকে নিজ হাতে নিজের কবর খুরিয়ে তাতে মেরে মাটি চাপা দেয়া হলো। তবে কাউকে কাউকে গুলি করা ব্যতিত গভীর গর্ত খুরে জীবিত মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হলো।

রাখেন আল্লাহ মারে কে? অলৌকিকভাবে এক ব্যক্তি বেঁচে রইলেন। সৈন্য চলে যাওয়ার পর তিনি মাটি সরিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন। তিনি পালিয়ে কাশগর এলেন। তারপর সেখান থেকে হিন্দুস্তানে এলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর সাথে আমার দিল্লীতে দেখা হয়। তখন তিনি হুবহু সেই ঘটনা শুনান, যা সির আসিয়াতে শুনেছিলাম।

সেসব উলামায়ে কিরামকে যেসব সৈন্য ঊষ পাহাড়ের পর্বতমালায় নিয়ে গিয়েছিলো, তারা একজন ছাড়া সবাই রুশী ও আরমানী ছিলো। একমাত্র

সৈন্যটি তাতারী ছিলো। সে উক্ত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে সেনা বাহিনী থেকে পালিয়ে উষ থেকে সমরকন্দ; সমরকন্দ থেকে শহরে সবজে এসে খোকন্দী হযরতকে সমস্ত ঘটনা শুনায়। পরে সে আফগানিস্তান চলে যায়।

তাইমুর বেগ আরো অনেক জুলুম-নির্যাতনের ঘটনা শুনালো। গত এক/দেড়মাস ধরে অসংখ্য উলামা-নওজোয়ানকে শহরে সবজ, গাজার ও কিতাব শহর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাতির অনেক নেতা-রাহনুমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আজকাল তো শহরে সবজ-এর গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্র গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যদেরকে মোতায়েন করা হয়েছে। বাসষ্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশনেও সিআইডি রাখা হয়েছে।

তাইমুর বেগ বললো ঃ তৌরাজাদা! এখন আপনার কি এরাদা?

– একবার শহরে সব্জ দেখতে চাই। ইসাম খান ও তাইমুর বেগ পরামর্শ করলো। এরপর বললো, ফল বিক্রেতার বেশে আপনাকে শহরে ঘুরতে পাঠানো হবে। এভাবে আপনি শহরের হাল অবস্থা অবলোকন করবেন। ফল বিক্রেতার বেশ পরলাম। দু'টি গাধায় আঙ্গুরের বস্তা উঠানো হলো। সাথে একজন ফল বিক্রেতার ছেলেও দেয়া হলো। চলতে লাগলাম। বেশ কয়েকটি দোকানে আমার ফল দেয়ার কথা হলো। চতুর্দিকে দেখতে থাকলাম, সৈন্য আর সৈন্য। পূরো শহরটাই যেন সৈন্যের দখলে। ফল নিয়ে যাচ্ছি। প্রায় অর্ধেকের বেশী শহর দেখা শেষ। পিছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছিলো। কিছুটা ভয় পেলাম। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি জেনারেল ষ্টোর থেকে একজন লোক ডাকছে। ডাকতে ডাকতে সে রাস্তায় নেমে এসেছে। তাকে দেখামাত্র চিনে ফেললাম। কারশী স্টেশনে যে তিনজন তাজিক-এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো, এ তাদের একজন। খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে সাক্ষাত করলাম। সে বললোঃ গাঁধা ছেড়ে দিয়ে পরে আমার সাথে সাক্ষাত করিও।

সে এই জেনারেল ষ্টোরের জেনারেল ম্যানেজার। বাকি কর্মচারীরা ইয়াহুদী। বিকেল চারটা বাজে তার কাছে পৌঁছে দেখি সে আমার অপেক্ষা করছিলো। বিভিন্ন কথাবার্তা হলো। এক পর্যায়ে বললোঃ

– এখন কোথায় যাবে?

– কারখী দেখার ইচ্ছে আছে।

– এখন সেখান থেকে কি আফগানিস্তান চলে যাবে?

– হ্যাঁ! যদি বাধ্য হয়ে যাই, তাহলে সেদিকেই পাড়ি জমাবো।

– এই মুহুর্তে কোথায় যাবে?

– তাইমুর বেগ অথবা মামাজানের কিল্লার দিকে।

– খবরদার! কিল্লার নামও নিওনা। কিল্লার অবস্থা খুব খারাপ। যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারো। দোষী-নির্দোষের কোন বাছ-বিচার এখন কম হয়। সন্দেহ হলেই গ্রেফতার। তাইমুর বেগের কাছে জায়গা থাকলে সেখানে থাকো। যদি জায়গা থাকে, তাহলে সির আসিয়া চলে যাও।

দোকানের মালিক আমাকে দোকানের মালগুলো ঠিকঠাক করে রাখতে বললো। আমি তা করলাম। তার পারিশ্রমিক হিসাবে পাঁচ রুবেল দিলো। আমি লাটিন হস্তাক্ষরের ন্যায় অক্ষরে দস্তখত করলাম। ইয়াহুদী লোকটি দেখতে লাগলো। এরপর বললো, কালকেও এসো। কোন কাজ থাকলে দেবো।

সন্ধার পূর্বে মাদ্‌রাসা মালিক আজদহর এ উঠলাম। ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে খুবই চিন্তিত ও বিষন্ন দেখা গেলো। পরে জানলাম, দু'জন শীর্ষস্থানীয় উস্তাদকে কমিউনিষ্টরা ধরে নিয়ে গেছে। আনুমানিক কুড়ি দিন হলো। অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পরও কোন হদীস মিলেনি। তাঁরা কি অবস্থায় আছেন, কোথায় আছেন, তা একমাত্র আল্লাহ মাবুদ জানেন। এখানে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। জামাআতে হাতে গুণা কয়েকজন লোক শরীক হলো। অনেকেই নিজ নিজ কামরায় নামায পড়ে নিলো। রাতের আঁধার ছেয়ে যাচ্ছে। খুব পেরেশান হলাম। কোথায় রাত কাটাবো জানি না। এই মাদ্‌রাসা-মসজিদে তো কোন অপরিচিত লোককে থাকতে দেয়া হয় না। এসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তাইমুর বেগকে দেখলাম। মালির পোষাকে এখানে এসেছে। আমার পাশ দিয়ে চুপচাপ চলে গেলো। মাজারে গেলো। দু'আ করলো। তৎপর পানি পান করতঃ কোন কথাবার্তা না বলে রওয়ানা হলো। আমার দিকে একটু চোখ উঁচিয়েও দেখলো না। বুঝতে পারলাম পরিস্থিতি ভালো নয়। হয়তো সে আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছে। সুতরাং এসব ভেবে আমি তার পিছে পিছে চললাম। এমনভাবে চললাম, যেন তৃতীয় কোন লোক আমাদের দু'জনকে দেখে এক সাথে যাচ্ছি সেটা বুঝতে না পারে। কিছু গিয়ে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখি পিছন দিক থেকে দু'জন লোক আসছে। এ দেখে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। লোক দুটো চলে গেলো। আমি আবার তাইমুর বেগের পিছু ধরলাম। ইতোমধ্যে তাইমুর বেগ একটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লো। গিয়ে দেখি সে জানালার ফাঁক দিয়ে আমার আসার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখামাত্র দরজা খুলে দিলো।

কথাবার্তা চললো। আমি বললাম, নতুন কোন খবর? নতুন খবর হলো, সরকার খোকন্দী হযরতকে সাইবেরিয়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। একথা শুনামাত্র শহরের লোকজন রাস্তায় নেমে আসে এবং চরম বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহরের কমিউনিষ্ট কর্মকর্তারা পরামর্শ করে ঘোষণা দিলোঃ একথা নিশ্চিত যে,

খোকন্দী হযরত একজন রূহানী। কিন্তু তিনি একজন সমাজসেবক। তাঁর পুরো জীবনটা জন-কল্যাণ ও সমাজসেবায় কেটে যায়। সুতরাং তাঁকে তাঁর সমাজসেবার কাজে বাধা না দিয়ে স্বীয় অবস্থার ছেড়ে দেয়া হবে।

এহি ঘোষণা পত্রটি পুরো শহরে ঢোল পিঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো। এভাবে শহরের লোকের মধ্যে উত্তেজনা কমলো। কিন্তু এই পিছুটান একটি সাময়িক ব্যাপার ছিলো। কয়েকদিন পর শহরে গোয়েন্দা পুলিশের সংখ্যা বেশী করে দেয়া হলো। খোকন্দী হযরতের কিল্লায় সাদা পুলিশ মোতায়েন করা হলো।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেশের পরিস্থিতির উপর কথা হলো। সারাদেশে যেভাবে মুসলিম নিধন চলছিলো, মনে হচ্ছিলো যে, এরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হবে না। এক পর্যায়ে আমি একথায় উপণিত হলাম যে, আফগানিস্তান যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। সেখানের অবস্থা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আর বলাবাহুল্য যদি সেখানের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়, তাহলে হিন্দুস্তান চলে যাবো– ইনশাআল্লাহ।

শান্তির আশায় আফগানিস্তানের পথে যাত্রা

পরিশেষে সফরের মোড় আফগানিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। শেষবারের মতো মামাজানকে দেখার আশা বুকে রয়ে গেলো। তাইমুর বেগ আম্মাজানের দেয়া বিছানাটুকু হাতে তুলে দিলো। রেল-স্টেশনে পৌঁছলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তিরমিযগামী ট্রেনে আল্লাহর নামে ঝটপট উঠে পড়লাম। কারখী স্টেশনের এক স্টেশন পূর্বে একটি স্থান। নাম ইমাম জাফর। একটু দূরে একটি মাজার। এই মাজারের নামে এই স্থানের নাম। নিয়ম অনুযায়ী নাকি ঘটনাক্রমে এখানে ট্রেন থামলো, তা জানি না। আমার ডাব্বার অনেক লোক নেমে গেলো। পরিশেষে আমার পাশে বসা ফারগানী যুবক দু'টিও নেমে গেলো। সবাই রেল লাইনের উপর দিয়ে হেটে চললো। অগত্যা আমিও নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে তাদের পিছে পিছে চলতে লাগলাম।

দু/তিন মিনিট পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারিদিকে দেখলাম। রেল গাড়িটি চোখের আড়াল হয়ে গেছে। সবাই লাইন ধরে এগিয়ে চলছে। আমিও সেই ফারগানী যুবক দুটির পিছু রইলাম। কিছু জানিনা। কোথায় যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি। সামনে কি আছে। চলছি এক নিরুদ্দেশে। কিছুক্ষণ চলার পর দেখি সামনে আমূ দরিয়া।

দুপুর বারোটা সবাই হাত মুখ ধুইলো। আমিও হাত মুখ ধুইলাম। যুবক দু'টো একটু দূরে বসলো। আমিও তাদের থেকে একটু দূরে বসে ব্যাগ থেকে

রুটি আর আঙ্গুর বের করলাম। রাস্তায় যুবক দু'টি কোন কথা বলেনি। আমিও বলিনি। এখন আমি ইচ্ছাকৃত রুটি-আঙ্গুর নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে বসে পড়লাম এবং উজবেক নিয়ম অনুযায়ী সালাম করলাম ও দু'আ দিলাম। –ইয়মূল বূলিসুতুন হার মান্‌গ্ লর– "আপনার যাত্রা শুভ হোক এবং নিরাপদে যথাস্থানে পৌছে যান।" তারাও সালামের উত্তর দিলো এবং দু'আ দিলো। দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করলো। সাথে তাদের ছাতুর তৈরী একটি বিশেষ খানা সামনে পেশ করলো।

একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলো ঃ

– আপনিও ইমাম সাহেবের মাজারে যাবেন?

– জ্বী - হ্যাঁ।

– কারী মাসউদের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছেন?

– কোন্ কারী মাসউদ?

– কেন চিনেন না। পাইতোকের কারী মাসউদ।

চিন্তায় পড়ে গেলাম। অনেক দিন আগে পাসপোর্টের জন্য আন্দরজানে গিয়েছিলাম। তারপর পাইতোকে তার মেহমান হয়েছিলাম। কিন্তু এরা কারা তাতো জানিনা। তাই চুপ থাকাটা ভালো মনে করলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ইমাম জাফর-এর মাজারের দিকে যাত্রা করলাম। সমুদ্রের পাশ দিয়ে চলছি। এই স্থানটির নাম বনগাঁও। গ্রামের গলিতে চলতে চলতে একটি সুন্দর মসজিদ নজরে পড়লো। মসজিদ সমুদ্রের পাশে, একটি বড় পাথরের মতো মনে হচ্ছিলো এবং পানির অনেক ভিতরের দিকে ছিলো। মসজিদের মনোরম দৃশ্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমূ দরিয়া তিরমিযের দিক থেকে বয়ে আসে। তার উচ্ছল ঢেউ-কলতান যেন মসজিদবি কদম ধুইয়ে দিয়ে বয়ে চলছে ভাটির দিকে। মসজিদের সাথে ইমাম জাফর-এর মাজার। আমি মসজিদের ছোট দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দেখি সামনের বারান্দায় কারী মাসউদ পায়চারি করছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাথীরা নেই।

যোহরের নামাযে আনুমানিক আট/নয়জন লোক শরীক হলো। কারী মাসউদ ইমাম ছিলো। নামায শেষে সবাই গোল হয়ে বসলো। এটা তুর্কিস্তানের নিয়ম ছিলো। সবাই নামায শেষে গোল হয়ে বসে যেতো। ইমাম সাহেব কোন আয়াত তিলাওয়াত করে তার তাফসীর করতেন। আমাকে তিলাওয়াত করার জন্য বলা হলো। ঘটনাক্রমে মুখে সূরা দাহর জারি হয়ে গেলো। খুবই আন্তরিকতার সাথে করুণ সুরে পড়লাম। আমিও খুব কাঁদলাম। আর উপস্থিত সবাই কেঁদে একাকার হয়ে গেলো। আনুমানিক এক ঘন্টা দরস চললো।

সবাই নিজ নিজ ঘরে চলে গেলো। ইমাম সাহেব হুজরাখানায় বসে আছেন। আর আমি মসজিদে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমার সেই ইস্তেখারার কথা মনে পড়লো, যা আমি বুখারার মাগাক মসজিদে করেছিলাম। খুব আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখলামঃ

"তিরমিযের টিকিট কেটে রেলগাড়ীতে উঠেছি। হঠাৎ করে গাড়ী একটি জন-মানবহীন এলাকায় থেমে গেলো। লোকজন বললো, এ স্থানটির নাম ইমাম জাফর। কিছু লোক গাড়ী থেকে নেমে গেলো। আমিও নামতে লাগলাম। একজন লোক বললো, তোমার স্টেশন এখনো দেরি আছে। এরপর দু'জন ফারগানী যুবকের সাথে সাক্ষাত হলো। তাদের সাথে গাড়ী থেকে নেমে গেলাম। আর আমি এই মুহূর্তে هل اتى على الانسان (হাল-আতা- আলাল্ ইন্সানি) অর্থাৎ সূরা দাহ্র পড়তেছিলাম। ইমাম সাহেব আমার তিলাওয়াত শুনে কাঁদতেছিলেন। অতঃপর আমি আফগান সীমান্তে গেলাম। বারো-তেরোজন আফগানী আমাকে ধরে ফেললো। আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, সে নিয়ে তাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দিলো। কিন্তু এরপরও তারা সবাই আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছিলো। খানা খাওয়াচ্ছিলো, আদর-যত্ন করছিলো এবং সান্তনা দিচ্ছিলো। আমার মনে চিন্তা-পেরেশানী অনুভব হচ্ছিলো না। এরপর চোখ খুলে গেলো।"

এই স্বপ্নের প্রথম অংশ বাস্তব হয়ে গেছে। হুযূর (সাঃ)-এর ইরশাদ, সেই ইরশাদের উপর পাক্কা ঈমান হলো যে, যখন তোমরা কোন কাজ করার ইচ্ছে করো, তখন ইস্তেখারা করে নাও। এক ধরনের অপূপ্য ঈমানী জোশ অন্তরে অনুভব করলাম। অনিচ্ছাকৃত তুর্কী ভাষায় চেচিয়ে উঠলামঃ আয় আল্লাহ! তোমার সত্ত্বার উপর আমি ঈমান আনছি। তোমার সত্ত্বা সর্বস্থানে বিদ্যমান। তুমি হিফাজতকারী, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি রিযিকদাতা, তুমি শ্রবণকারী, তুমি সর্বদ্রষ্টা। জীবন-মরণ তোমারই হাতে। কমিউনিষ্টরা জাহিল, গাফিল এবং জালিম। আমি তোমারই ক্ষমতার উপর ভরসা করছি এবং তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।"

আমার এসব কথা শুনে কারী মাসউদ কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

– মুসাফির ছেলে! কোথায় যেতে চাচ্ছ?

– কারখী যাবো।

– পারমিট আছে?

– পারমিট আবার কি জিনিস? ওতে কি হয়?

– পারমিট অনুমতিপত্রকে বলে। যা সোভিয়েট মিলিটারী কমাণ্ডার দিয়ে থাকে।

– পারমিট তো নেই। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

– পোল দারী– পয়সা আছে?

– জ্বী – হ্যাঁ। পয়সা আছে।

এরপর পাঁচ রুবেল বের করে কারী সাহেবের হাতে তুলে দিলাম। কারী সাহেব খুব খুশী হলেন। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

– নিজের জন্য কিছু রেখেছো?

– আল্লাহ্ অনেক দিয়েছেন। আল্-হামদুলিল্লাহ! পয়সা আরো আছে।

– আমি কারশীতে বেশ কিছু কাপড় কিনেছিলাম। যেগুলো তাইমুর বেগ বেশ লাভে বিক্রি করে দিয়েছেন। আসার-সময় আসল লাভ সর্ব কিছু আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার সব টাকা থেকে অর্ধেক টাকা বের করে কারী সাহেবের সামনে রেখে বললামঃ রাখুন! এগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন। কারী সাহেব বললেন, আরে দেওয়ানা বালা-বোকা ছেলে! সামনে তোমার টাকা-পয়সার খুব প্রয়োজন হবে। কারখীর লোক নিমনগানীদের মতো দাতাও নয়, রহম দিলও নয়। এরপর এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন। তুমি আযম খান নিমনগানী না? আমি বললাম জ্বী– হ্যাঁ কারী সাহেব। আমি আপনাকে প্রথমবার দেখামাত্র চিনেছি। কিন্তু এতোক্ষণ তা বলিনি। আপনি কি নিমনগানে আসেননি? অবশ্যই এসেছেন। অসংখ্য উলামা-তালাবা আমাদের নিমনগানে এসেছেন। জলসায় কথা বলেছেন। আমাদের বাগানে থেকেছেন। বাগানের ফল খেয়েছেন। প্রায়ই আমাদের গ্রামে ইসলামী জলসা হতো। আহ! আমরা নিজ দেশে দেশান্তরিত। নিজ বাড়ীতে বন্দী-পরাধীনা। স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশেও আমরা পরাধীন। দেশের বৈধ ও জন্মগত সূত্রে নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সকল ধরনের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অপরাধ শুধু আমরা সৎ, অপরাধ আমরা আল্লাহভীরু, অপরাধ আমরা ন্যায়-পরায়ণ। প্রভুর বিশাল পৃথিবীতে আজ আমাদের মাথা গুজাবার ঠাঁইটুকু নেই। কারী মাসউদ এই মুহূর্তে অতীতের কথা- স্মৃতি স্মরণ করে ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকলো। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেলো। কথার বিষয় পাল্টে ফেললাম। খোদ কারী সাহেব বলে উঠলেন ঃ

আমি আনুমানিক দেড় বছর এখানে আছি। তুমি যোহরের সময় যে কিরাআত পড়েছো, তা আমার অন্তরকে গলিয়ে ছেড়েছে। যখন তুমি দ্বিতীয় রুকু শুরু করেছো এবং فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما اوكفورا

(ফাস্‌বির লিহুকমি রাব্বিকা ওয়ালা তুতি মিনহুম আ-সিমান, আও কাফূরা)

– অর্থাৎ "সুতরাং আপনার প্রভুর নির্দেশের জন্য ধৈর্য্য ধরুন এবং আপনি তাদের মধ্যে গুনাহগার ও নাফরমানদের অনুসরণ করবেন না।" দ্বিতীয়বার পড়ছিলে, তখন আমার দৃষ্টি তুর্কিস্তানের সেসব বীর সন্তান ও মহান বুযুর্গদের প্রতি নিপতিত হয়, যাঁরা এই আয়াতের উপর আমল করে দেখিয়েছেন। রুশীরা তাঁদেরকে ক্রয় করার সর্বোপরি চেষ্টা-কুশেশ করেছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর তাদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছে। তারপরও তারা পদচ্যুত হননি। তৌরাযাদা! এই জালিমরাই কাজী আবদুল মজিদ খাঁকে রাতের আঁধারে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে তাঁকে বেঁধে এমনভাবে প্রহার করেছ, যাতে শুধু প্রাণটা বেঁচে থাকে। তারপর জালিমরা তার জখমগুলোতে চুন লাগিয়ে দেয়। এরপর একটি গর্তে তাঁকে নিক্ষেপ করে উপর থেকে গরম ছাই ঢেলে দেয়া অনন্তর জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "এখনও বলো, তুমি আমাদের কথা মানবে, তাহলে ছেড়ে দেবো। তখন তিনি সূরা দাহর এর এই আয়াতটি পাঠ করেন। এরপর তাঁকে এ অবস্থার চুন দিয়ে চাপা দেয়া হয়।

হযরত মুহীউদ্দীনকে ধরে নিয়ে বলা হয় যে, যদি আপনি লেনিনকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমকক্ষ মনে করেন এবং আপন অনুসারীদেরকে তার শিক্ষা দেন, তাহলে আপনাকে, আপনার সন্তানাদিকে এবং আপনার অনুসারীদেরকে আইনের উর্ধ্বে ঘোষণা দেয়া হবে। যতো বড়ই অন্যায় করা হোক না কেন তাদের কাউকেই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে না। হযরত মাওলানা (রহঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে, সুস্থ্য মস্তিষ্কে বলেনঃ চে নিসবত খাক রা বা আলমে পাক! পবিত্র জগতের সাথে মাটির কি তুলনা হতে পারে? লেনিন তো সেই মাটির সমানও হতে পারবে না, যে মাটিতে নবীজী (সাঃ) পবিত্র মল-মূত্র ত্যাগ করতেন। সে তো চরম জালিম, চরিত্রহীন, বস্তুবাদী। বস্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তু অস্বীকারকারী। আর যারা একত্ববাদ, পরকাল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী, তাদেরকে সে মানুষরূপে গণ্য করেনি। অপরদিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত। আমীর-ফকীর, আশরাফ-আতরাফ-এর সব ধরনের অপপ্রথা প্রতিরোধকারী। যাঁর জীবনাদর্শ একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নির্মল ও আদর্শ সমাজের অপূর্ব নমুনা পেশ করে গেছে। যিনি একাধারে একজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব। মোটকথা, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার পরে যে সত্তাটির স্থান, তিনি হলেন সাইয়্যেদুল কাউনাইন, সাইয়েদুল

মুরসালীন, আকায়ে মক্কী, মুহাম্মাদে আবারী হযরত আহমাদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত মাওলানার এই জবাব শুনে কমিউনিষ্টরা ভীষণ ক্রোধান্বিত হলো। তাঁকে একটি উঁচু স্থানে দাঁড় করালো। ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচটি গ্রুপ তৈরী করা হলো। এক গ্রুপ মাথাকে নিশানা বানালো, এক গ্রুপ রানকে নিশানা বানালো, একগ্রুপ বুককে নিশানা বানালো, এক গ্রুপ কাঁধকে নিশানা বানালো, আর একগ্রুপ হাটুকে নিশানা বানালো। সবাই এক সাথে ফায়ার খুলে দিলো। এক পলকেই হযরত মাওলানার শরীর মুবারক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো। আর প্রাণ পাখিটি জান্নাতের পাণে পাড়ি জমালো।

এই মর্মান্তিক খবর তারা লুকানোর অপচেষ্টা করলো। কিন্তু এলাকার আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সবার জানতে বাকি রইলো না। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইসলামের হক্কানিয়্যাত প্রমাণিত হলো। সবার হৃদয়ে এই ঘটনা বিরাট দাগ কেটে গেলো। তুমি যখন সূরা দাহর পড়ছিলে, তখন বুযুর্গানে দ্বীনের সেসব স্মৃতি মানসপটে উথলে উঠছিলো।"

কারী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। বললেনঃ তৌরাযাদা! এখানে কিভাবে এবং কি জন্য এসেছিলেন?

– ইমাম কারখীর মাজার যিয়ারত করতে এসেছি। কারখীতে আপনার কোন পরিচিতি লোক থাকলে বলুন। ঠিকানা দিলে ভালো হয়।

– হ্যাঁ দু'জন পরিচিত লোক আছে। লঞ্চ এখান থেকে প্রত্যেকদিন চারটার সময় সমুদ্রের ওপারে যায়। সমুদ্রে পাসপোর্ট এবং পারমিট চাইবে। বলবেন কারী মাসউদের ভাই হই। আর আমি একজন ছাত্র। বড় মাজার দেখতে যাচ্ছি। গতকাল ছাত্রদের মধ্যে মাজারের দৈর্ঘ্য নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কেউ বলেছে সাতগজ। তাই স্বচক্ষে দেখার জন্য যাচ্ছি। যদি যেতে দেয়, তো ভালো কথা, অন্যথায় পরিস্থিতি লেজে-গোবরে হয়ে যাবে; সেটা আগেই মনে রাখবেন।

আমি 'দালাইলুল খাইরাত' নামক একটি দু'আর বই এবং আম্মাজানের দেয়া কুরআন মজীদ সাথে নিলাম। অবশিষ্ট সবকিছু, যার মধ্যে একটি দামি পকেট ঘড়ি, একটি মুল্যবান ক্যালেণ্ডার, দু'হাজারের কিছু বেশী রুবেল ব্যাগটিসহ কারী সাহেবের হাতে দিলাম। এরপর বললামঃ

"এসব কিছু আপাততঃ আপনার কাছে রাখুন। যদি রুশী ফৌজদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম, তাহলে দরিয়া পার হয়ে গিয়ে সেই লোকদের মাধ্যমে খবর দিবো, যাদের নাম বললেন। যদি ভালো মনে করেন, তখন এসব কিছু পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু যদি তাদের হাতে ধরা পড়ে যাই, তাহলে আপনার সাথে কোন

ধরনের সম্পর্কের কথা একেবারে অস্বীকার করবো, আর আপনিও আমার সাথে আপনার কোন পরিচয়ের কথা স্বীকার করবেন না।"

কারী সাহেব আমার জিনিসগুলো রাখলেন। আমি সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখনো আমি মসজিদের দরজায় ছিলাম। কারী মাসউদ কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার পারে পড়লেন। বলতে লাগলেনঃ

সাইয়েদযাদা! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে তওবা করছি। আমি খুবই দুর্ভাগা। বড়ই গুনাহগার। দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে মাফ করে দেন।" অনেকক্ষণ তিনি এরকম করলেন। আমি খুব বিব্রতবোধ করলাম। ভাবলাম এ কোন পরিস্থিতিতে পড়লাম। তিনি বার বার বলছিলেন, আমি তওবা করছি, আমি তওবা করছি। পরিশেষে আমি শান্তনা দিলাম, আল্লাহ্ মাফ করেন, আল্লাহ মাফ করেন। এরপর সালাম বলে বিদায় নিলাম। পরে জানতে পারলাম যে, কারী সাহেব আত্মরক্ষার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি সিআইডি পুলিশের চাকরীও নিয়েছিলেন।

লঞ্চঘাট বেশী দূরে ছিলো না। লঞ্চ ঘাটে তৈরী ছিলো। আমি লঞ্চে উঠে এক কোণে বসে গেলাম। সমুদ্রের ওপারে তুর্কামানিস্তানের এলাকা শুরু হয়। আর তুর্কামানিস্তানের সাথে আফগান বর্ডার রয়েছে। কারখী তুর্কামানিস্তানের পুরানো শহর। দেশে-বিদেশে এর পরিচিতি রয়েছে। প্রসিদ্ধ আলিম ও বুযুর্গ হযরত ইমাম মারূফ কারখীর মাযার এই শহরে।

লঞ্চ অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে গেছে। এ সময় একজন সশস্ত্র সৈন্য বিদেশীদের থেকে পাসপোর্ট আর দেশীদের থেকে পারমিট চাচ্ছে। এক পর্যায়ে আমার কাছে পাসপোর্ট চাইলো। আমি বললামঃ আমি বিদেশী নই।

– তাহলে পারমিট দেখাও।

– পারমিট তো নেই। আমি ছাত্র মানুষ। বড় মাজার দেখতে যাচ্ছি। আবার দু'একদিনের মধ্যে চলে আসবো। একথা বলার দেরি নেই। ধপাস করে এক থাপ্পর মারলো আমার মুখে। সাথে সাথে মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। চোখে আর কিছু দেখছিনা। মাথা ঘুরতে লাগলো। যেহেতু এক কোণায় বসা ছিলাম। ধুরুম করে দরিয়ায় পড়ে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি সাঁতার জানতাম এবং পানিতে ডুবে অনেক্ষণ পানিতে ডুবে রইলাম। উপরে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। ফৌজটি পিস্তল দিয়ে বেশ কটি গুলি করেছে। কিন্তু আমি যেহেতু দক্ষিণ দিকে সরে ছিলাম, তাই আমাকে লাগেনি। বিশ-পঁচিশ মিনিট অনেকটা বেহুঁশ অবস্থায় পানিতে ডুবে- ভেসে রইলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি লঞ্চটি বহুদূরে চলে

গেছে। শরীরে শক্তি পাচ্ছিলাম না। এক পর্যায়ে পুনরায় বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ আসার পর দেখি একটি কাঠের টুকরা ভাসছে। কুরআনে কারীম আর দু'আর বইটি যথারীতি কাঁধে বাধা ছিলো। কাঠের টুকরাটি ধরলাম। সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের একটু পূর্বে একটি শুকনো স্থানে উঠে পড়লাম। আস্তে আস্তে শক্তি ফিরে পেতে লাগলাম। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। পনের-বিশ মিনিট পর সিজদা থেকে উঠে মনে হলো, আমি পূর্ণ সুস্থ্য মানুষ। কোন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার আমি হইনি।

চাঁদনী রাত ছিলো। বহুদূর পর্যন্ত বন-জঙ্গল দেখা যাচ্ছিলো। কারখী মনে হয় কয়েক মাইল উত্তরে রয়ে গেছে। বাতাস বইতেছিলো। কাপড়-চোপড় সব ভেজা। তাই ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপতেছিলো। একটি গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। সেখানে বাতাস লাগছিলো না। একটি স্থানে দেখি অনেকগুলো গাছের কাণ্ড এক সাথে। মনে হচ্ছিলো কুদরতি ভাবে এরূপ করা হয়েছে। সেই গাছের আড়ালে ঘুমালাম। তৃপ্তির সাথে সারা রাত ঘুমালাম। সকাল-সকাল উঠে আযান দিলাম। ফজরের নামায আদায় করলাম। তারপর দরিয়ায় পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম। আনুমানিক দু/তিন মাইল চললাম। আরো ঘন-জঙ্গল এলো। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকলাম। খোদার অপার কুদরত দেখতে পেলাম। দেখি অসংখ্য শাহতুত গাছে বিভিন্ন সাইজের শাহতুত রয়েছে। ক্ষিধেও লেগেছিলো প্রচুর। খেলাম ইচ্ছে মতো। হৃদয় খুলে খোদার শুকর আদায় করলাম। জঙ্গল থেকে বের হয়ে দেখি, অদূরে দু'টি শহর দেখা যাচ্ছিলো। সাথে সাথে শহরের দিকে চললাম। দুপুরের একটু আগে শহরতলীতে পৌঁছলাম। হাটতে হাটতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। একটি গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য শুইলাম। সাথে সাথে ঘুম এসে গেলো। দীর্ঘক্ষণ পর ভীষণ হৈ চৈ এর দরুণ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ খুলে দেখি বিশাল আকৃতির পাঁচজন লোক। গোঁফগুলো বড় বড়। চেহারা-সূরত দেখে তুর্কিস্তানী মনে হচ্ছিলো না। এরা আমার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছিলো। শেষে সিদ্ধান্ত হলো এই ছেলেকে আস্তানায় নিয়ে যাওয়া হোক। সবাই আমার দিকে মনোনিবেশ করলো। একজন ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলোঃ

– তু- কেইস্তী? আয্কুজা আমুদী? চে এরাদা মী দারী?– তুমি কে? কোথ থেকে এসেছো? কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে করেছো? আমি হাত দিয়ে ইশারা করলাম তোমাদের কথা বুঝিনা। তোমরা কি বলো?

তারা আমাকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেলো। অনেক বড় একটি মেহমানখানা। আমরা বড় একটি হলে প্রবেশ করলাম। সেখানে তাদের মতো আরো সাতজন মানুষরূপী দেবতা ছিলো। এক কোণায় মুরগ-মুরগী ডাকছিলো।

হলে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিলো। তারা আমাকে একটি খাটে বসালো এবং পরস্পরে কথাবার্তা শুরু করলো। আন্দাজ করছিলাম যে, তারা আমার ব্যাপারেই কথাবার্তা বলছিলো। যারা আমাকে এনেছিলো, তারা রিপোর্ট দিলো। অপর সাতজন এ সময় আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলো।

কিছুক্ষণ পর খানা এলো। তারাও খেলো, আমাকে খেতে দিলো। খানার পর আবারো কথা শুরু হলো। একজন আমার কাঁধ থেকে পোটলাটা খুললো। কিতাব দু'টি দেখে আশ্চর্য হলো। একজন জিজ্ঞাসা করলোঃ

– এগুলো কি?

– দালাইলুল খাইরাত এবং কুরআন শরীফ।

– এগুলো ভেজা কেন?

– আমি দরিয়ায় পড়ে গিয়েছিলাম। অনেক কষ্টে বেঁচেছি।

– আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথমে কুরআন শরীফ রোদে শুকাতে দাও। পরে কথা বলবো। এ কথাটি একজন বললো। তাকে অত্যন্ত দয়ালু মনে হলো। মেহমানখানার এক কোণে রোদ আসছিলো। সেখানে কুরআনে কারীমও কিতাবটি শুকাতে দিয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর দয়ালু লোকটি এলো। ফারসীতে আস্তে আস্তে বলতে লাগলোঃ বাবা! তুমি এখন পালিয়ে যেতে পারো। জলদী করো। দেরি করিওনা। তোমার ভাগ্য ভালো; বেঁচে গেলে। যেখানে তুমি শুয়ে ছিলে, সেখান থেকে একটু দূরে মাজার মসজিদ। পালাও, পালাও, জলদী পালাও!

তড়িঘড়ি দাঁড়িয়ে গেলাম। এক মূহুর্তও সেখানে রইলাম না। বের হয়েই জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

এরপর কারখীতে তিন মাস থাকার সুযোগ হয়েছিলো। পরে জানতে পারলাম যে, এই লোকগুলো মাজার-ই-শরীফের গভর্নরের লোক। এরা গোয়েন্দা পুলিশ। যেসব লোক পালিয়ে আফগানিস্তান যেতে চায়, তাদেরকে ধরে সোভিয়েত সরকারের হাতে তুলে দেয়। কারী মাসউদও এই দলে যোগ দিয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা গোয়েন্দাদের হৃদয়ে দয়া ঢেলে দিয়েছেন। তারা আমাকে মুক্ত করে দিলো। অন্যথায় জালিম সরকারের জেলখানায় যুগ যুগ পড়ে থাকতে হতো। সেখানে ধুকে ধুকে মরা ছাড়া আর কোন উপায় থাকতো না।

মাগরিবের আগে আগে মাজারের সীমানায় ঢুকলাম। সামনে একটি কিল্লার মতো দেখতে মসজিদ। মসজিদে প্রবেশ করলাম। বারান্দা অনেক বড়। ভিতরের স্থানও কম নয়। পাশে বড় বড় কামরা। মাদরাসা ও খানকা আছে। মোটকথা, তুর্কিস্তানী মসজিদে যা থাকে, সবকিছু এখানেও আছে। পূর্বদিকে বিরাট কবর।

এটিই প্রসিদ্ধ বুযুর্গ-মুহাদ্দিস মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর মাজার। ইতোমধ্যে আযান হলো। একজন কালো কুচকুচে মানুষ আযান দিলো। তুর্কিস্তানে এমন কালো মানুষ আর দেখিনি। তিনিই নামাযও পড়ালেন। আমি ও আরেকজন মুসল্লী। ফরয শেষে লোকটি চলে গেলো। ইমাম সাহেব সুন্নাত পড়লেন। আমি সুন্নাত-নফল পড়ে মাজারের দিকে যাত্রা করলাম। এর মধ্যে ইমাম সাহেব বললেনঃ এদিক দিয়ে রাস্তা নেই। সাথে সাথে তিনি রাস্তা দেখিয়ে দিলেন এবং মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

রাতের আঁধার সারা জগতকে ছেয়ে নিলো। চারদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। মাজারের জিয়ারত শেষে ভীষণ পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মসজিদের চারিদিকে ঘুরলাম। দেয়াল খুব মোটা ছিলো। এরপর ইমাম সাহেবকে ডাকতে ব্যর্থ হয়ে, দাঁড়িয়ে রইলাম। মসজিদের পূর্ব দিকে বিশ-পঁচিশ একর জমি ফসলের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। পাশে একটি কুপ। কুপের পাশে একটি বড় গাছ। গাছের ডাল-পালাগুলো আনুমানিক সোয়াশো বর্গফুট এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। গাছের নীচে উটের পিঠে বাধার জন্য কিছু পুরানো তোষক পড়ে আছে।

গাছে উঠলাম। পতিত তোষক দিয়ে গাছে মাচান তৈরী করে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। ইশার নামায পড়ে শুয়ে পড়লাম। সেহরীর সময় চোখ খুললো। গাছ থেকে নামলাম। তাহাজ্জুদের নামায পড়ে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করলাম। ফজর হলো। ইমাম সাহেবকে অনেক ডাকলাম। কিন্তু তিনি দরজা খুললেন না। অগত্যা বারান্দায় নামায পড়ে নিলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তুর্কিস্তানের মুসলমানদের আজ কি চরম দুর্দিন যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা করে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লাম। অবশেষে ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করলাম। জঙ্গলে গিয়ে তুত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। রাতে সেই মাচানে থাকতাম। আর পেটের দোজখকে তুত দিয়ে নিভাতাম।

সূর্য প্রায় মাথার উপর উঠে গেছে। তুতের জঙ্গল থেকে বের হলাম। চষানো জমিগুলোতে কয়েকজন তুর্কামান কৃষক কাজ করছে। তাদের কাছে গেলাম। অনিচ্ছাকৃত তাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে ফেললাম। সাথে সাথে তুর্কিস্তানী রীতিতে দু'আ দিলাম- হার মানগ লর- তোমাদের মেহনত সফল হোক। তারাও অত্যন্ত জোশের সাথে উত্তর দিলো। সম্ভবতঃ এরা সবাই নতুন কৃষক। এদের কাম-কাজে তেমন নিপুণতাও নেই ; নেই কোন শৃঙ্খলা। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

– তোমরা এই ড্রেন কি জন্য করছো?

– টমেটো গাছ লাগাবো।

– টমোটো? এভাবে তো টমেটো ভালো হবে না। পানি পুরাপুরি বয়ে যাবে না। বরং জমে থাকবে আর এতে টমেটো গাছ মরে যাবে। পানি শুকাতে শুকাতে মৌসুম শেষ হয়ে যাবে ; সকল মেহনত বেকার হয়ে যাবে।

কৃষকরা সবাই খুব খুশী হলো। বলতে লাগলো– আয় বালা! তাংগারী বার লা-কা ইউসুন–আয় ছেলে! আল্লাহ তোমার উপর বরকত নাজিল করুক; তুমি বলো কিভাবে টমেটো লাগাতে হয়?

ফারগানায় শাক-সব্জির ক্ষেত শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়; শহরেও করা হয়। এজন্য আমি শাক-সব্জির ক্ষেত করতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের বাড়ীতে টমেটো, মূলা, শালগম, গাজর, পিয়াজ ইত্যাদির ফসল করতাম। আট দিন পর্যন্ত তাদের কাজ করে দিলাম। কাজ শেষ হলো । তারা আমাকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়াও খুশী হয়ে চল্লিশ রুবেল দিলো। প্রতিদিন বারোটা-একটা পর্যন্ত কাজ করতাম। একদিন একজন রুশী কর্মকর্তা এসেছিলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে যায়। সাথে সাথে তাকে হাসপাতাল নিয়ে পাওয়া হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাঁচিয়ে দেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তুর্কামানী কৃষকদের সাথে মিশে গেলাম। তাদের মতো পোষাক-পরিচ্ছদ বানিয়ে ফেললাম। একেবারে খোলামেলাভাবে তাদের সাথে মিশে গেলাম। তাদের ঘরে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে লাগলাম। আমি শুধু কৃষি কাজ নয়; বরং সবধরনের কাজ-কাম করতাম। এভাবে কারখী শহরেও যাতায়াত হতো। কারী মাসউদ যে তিনজন লোকের ঠিকানা দিয়েছিলেন, তাদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তাদের মাধ্যমে আমার আমানতও পৌঁছে গেলো।

এখন বসন্তকাল শুরু হয়ে গেছে। গাছের উপর আমার আস্তানা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার শিকার হলো। ফার্মের ইয়াহুদী ম্যানেজার থেকে ফার্মের কাছে পাওনা আগেই আদায় করে নিয়েছিলাম। তা থেকে বেশ কিছু টাকা কৃষকদেরকে দিয়েছিলাম। এতে তারা আরো অধিক খুশী হয়। তাদের সাথে আন্তরিকতা আরো গাঢ় হয়। তারা হযরত কারখী (রহঃ)-এর মাজারের পাশে একটি কামরা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিলো। একটি সার্টিফিকেটও তারা জোগাড় করে দিলো। যাতে লিখা ছিলোঃ "এই লোকটি উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী কৃষি ফার্মের তত্ত্বাবধায়ক।" এই সার্টিফিকেট আমার জন্য খুবই লাভজনক প্রমাণিত হলো। এর মাধ্যমে শহরে-বন্দরে নির্দ্বিধায় ঘোরাফেরা করতাম। দুপুর বেলা

সাধারণতঃ শহরেই কাটাতাম। একদিন শহর থেকে আটটি তুর্কামান রুটি কিনলাম। তুর্কামান রুটি বড় বড় হয়। এক একটি রুটি পৌঁনে দু'সের হয়। রুটিগুলো মাথায় নিয়ে ইমাম কারখীর মাজারের দিকে রওয়ানা হলাম। অনিচ্ছাকৃতভাবে মেইন রোড ছেড়ে অন্যপথে হাটতে লাগলাম। শহর থেকে দূরে চলে গেলে অনুমান হলো যে, আমি একটি ভয়াবহ পথে এসেছি। একটু পরেই একটি ফৌজী ক্যাম্পের কাছে এসে পৌঁছলাম। মনে হলো ফিরে যাবো। কিন্তু কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। এখন শহর থেকে বহুদূরে এসেছি। সড়ক থেকে বাম দিকে অদূরে একটি কিল্লা দেখা যাচ্ছিলো। স্থানে স্থানে সৈন্য পাহারা দিচ্ছিলো। আমি সৈন্যদের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সড়কের বা দিকে খোলা মাঠের দিকে গেলাম। অল্প কিছুদূর যেতে না যেতেই অদূরে ধুলো-ধূসর উড়তে দেখলাম। মনে হলো, কোন ব্যবসায়িক কাফেলা হবে। কিন্তু কাছে এসে তা দেখে রীতিমতো বিস্মিত হলাম। এ কাফেলা বন্দী তরুণীদের ছিলো। বার থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে সবার বয়স। সবাই এক করুণ পরিস্থিতির শিকার মনে হচ্ছিলো। সবার মুখে-মাথায় ধুলো-বালু ছিলো। অধিকাংশের পোষাক-পরিচ্ছদ ছেঁড়া-ফাটা ছিলো। চেহারা-সূরত দেখে সহজেই অনুমান হচ্ছিলো যে, এরা সবাই কোন বড় ঘরের কন্যা। প্রত্যেক মেয়ের হাতে এক একটি করে কোদাল এবং পায়ে মোটা চামড়ার জুতা ছিলো। যেগুলো সাধারণতঃ কাজের লোকেরা কাজ করার সময় পরিধাণ করে। আনুমানিক পঞ্চাশজন সৈন্য তাদেরকে ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মেয়েদের প্রথম গ্রুপটি আমাকে দেখলো। সাথে সাথে সবাই আমাকে ঘিরে ফেললো। আমার মাথায় রুটি দেখে তারা বলতে লাগলো– কাকা! তুমি রুটি বেচো? আমি বললাম না। তবে তোমাদের প্রয়োজন হলে নিতে পারো। আমি রুটিগুলো পঞ্চাশ টুকরা করে তাদের মধ্যে বন্টন করলাম। এই মেয়েগুলো সবাই বুখারা, সমরকন্দ, তাসকন্দ, খোকন্দ, আন্দারজান, নিমনগান, খোজনন্দ, কাগারা ও কারশী ইত্যাদি এলাকার ছিলো। আমি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে সবাই কেঁদে ফেললো। বলতে লাগলোঃ

আমরা কেউ জমিদারের মেয়ে, কেউ বড় আলিমের মেয়ে, কেউ বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে, কেউ বড় নেতার মেয়ে। আমাদের সবার নাগরিকত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দেশান্তর করা হয়েছে। আমাদের মা-বাবাদের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বেঁচে আছেন, কেউ মারা গেছেন। তবে আমরা জানিনা তাঁরা কে কোথায় আছেন। এখানে দিনে আমাদের দ্বারা ছয় ঘন্টা আর রাতে চার ঘন্টা বিভিন্ন ধরনের কাজ নেয়া হয়।

– এখন তোমরা কোত্থেকে থেকে আসছো?

– ক্ষেত থেকে।

ইতোমধ্যে তাদের জিম্মাদার এসে গেছে। দেখতে অত্যন্ত কঠোর সৈন্য মনে হলো। একজন অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বললোঃ তুমি কে?– তার চেহারা সূরত খুবই বিভৎস ছিলো। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, আজকে নিস্তার নেই। এখনো আমি জবাব দেইনি। এর আগেই মেয়েরা বলে উঠলোঃ "লোকটি রুটি বিক্রেতা। আমরা তার থেকে রুটি কিনেছি। এখন সে তার রুটির মূল্য চাচ্ছে।"

মজলুম মেয়েগুলির দুরাবস্থার কথা শুনে হৃদয়-চক্ষু রক্তঅশ্রু বহাতে লাগলো। কিন্তু কি করতে পারি। শুধু অন্তরে অন্তরে আফসোস করতে লাগলাম। হায় আজকে আমার মা-বোনদের এই দুর্দশা। মনে মনে বললাম, বোনেরা! লক্ষ্মী বোনেরা আমার! আমরা তোমার হতভাগা দ্বীনি ভাই। তোমাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদেরকে মাফ করে দিও। আর দু'আ করিও আল্লাহ যেন আমাদেরকে প্রতিরোধ করার, ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ নেয়ার তাওফীক দান করেন। এরই মধ্যে দ্বিতীয় সৈন্যটি জিজ্ঞাসা করে বসলোঃ মেয়েরা কি তোমার থেকে রুটি নিয়েছে, একথা কি ঠিক? তার একথার পর আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম। সৈন্যটি মনে করেছে যে, গরীব রুটি বিক্রেতা, পয়সার জন্য কাঁদছে। সে আমার দিকে সহমর্মিতার নজরে তাকালো। ইত্যবসরে অবশিষ্ট মেয়েরাও এলো। তারপর প্রধান নির্বাহী একটি কুপন লিখে দিয়ে বললো, কাল এসে পয়সা নিয়ে যেও।

বলতে ভুলে গিয়েছিলাম; যে স্থানে মেয়েদের সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো, সেটি জেলখানার গেইট ছিলো। মেয়েরা বড়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। প্রত্যেক মেয়ে নিজ নাম, বাপের নাম জোরে জোরে বলছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, আমি যেন তাদের নাম-ঠিকানা বুঝতে পারি। কিন্তু আমি মাত্র কয়েকটি নাম শুনেছি। একজন বলেছিলোঃ বাতুর বাঈ কানিজ খাদীজা মান্ আন্দরজান লেক– আমি বাইতুর বাঈ-এর মেয়ে খাদীজা; আন্দরজানের অধিবাসী। অন্যজন বললোঃ আন্দরজান লেক তৌরদী দামলা কাজন তৌরসুন এ– আমি আন্দরজানের তৌরদী দামলার মেয়ে তৌরসুন। আরেকজন বললোঃ লেক ইমাঈল জান কারী দামলা কায়িনী যুবাইদা দীদ ওয়ারলার– আমাকে নিমনগানের ইসমাঈল জান দামলার মেয়ে যুবাইদা বলে।

অপরজন একটু বিস্তারিত বলতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক অফিসার ধমক দিয়ে বললোঃ 'শুধু নাম বলো।' অতঃপর আমার দিকে রাঙ্গা চোখে তাকিয়ে বললোঃ এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো? ভাগো জলদি। অন্যথায়............। অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে অগত্যা সেখান থেকে চলে এলাম।

ভয় হলো যে, এটি নিষিদ্ধ এলাকা হতে পারে। গোয়েন্দাগীরি কিংবা অন্য কোন অভিযোগে ধরেও ফেলতে পারে। তাই বেশী ঘোরাফেরা না করে সোজা শহরের দিকে যাত্রা করলাম। মিল্লাতের বোনদের এ করুণ অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। নানান দুঃশ্চিন্তা আঁকড়ে ধরলো। তাদের সকরুণ আওয়াজগুলো এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। তাদের অসহায় চাহনী হৃদয়কে দংশন করছিলো। নিজেকে যেন খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। বার বার একথা মনের মধ্যে ঢেউ খাচ্ছিলো যে, হায় তুর্কিস্তানের ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন মুসলমান! তোমাদের ব্যক্তিত্ববোধ কোথায় গেলো? তোমাদের কন্যা-ঝিরা আজ জালিমদের ক্ষেত-খামারের দিন-মজুর।

শহরের কাছে গিয়ে রাস্তা পাল্টায়ে ফেললাম। বালুর টিবির উপরে উঠে শহরের দিকে তাকালাম। দেখলাম পশ্চিম পার্শ্বে জঙ্গলের সাথে একটি মসজিদ। সেদিকে যাত্রা করলাম। মসজিদে যখন পৌঁছলাম। তখন যোহরের শেষ সময় ছিলো। এটি একটি ব্যস্ততম মুসাফিরখানার মসজিদ ছিলো। আফগানিস্তান থেকে আগমন-প্রত্যাগমনকারীরা এখানে অবস্থান করে। মসজিদের নামাযী সাধারণতঃ তারাই হয়ে থাকে। উজু করে নামায পড়লাম। কিন্তু নামাযেও খেয়াল সেই মজলুম মেয়েগুলির দিকে রইলো। তাদের ধুলা-ধুসরিত চেহারা-সূরত চোখে ভাসছিলো। সালাম ফিরানোর পর দীর্ঘক্ষণ কেবলা রুখ হয়ে রইলাম। ইতোমধ্যে তন্দ্রা এলে পড়ে গেলাম। একটি মানুষ মসজিদের এক পাশে বসা ছিলো। আমার কাছে এসে বললোঃ আফগানিস্তান যাবে? আমার মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বের হলো– হ্যাঁ, যাবো। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। বলা তো যায় না, লোকটি কমিউনিষ্টদের এজেন্ট হতে পারে। সম্ভবতঃ সে আমার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছে যে, আমি ভয় পেয়েছি। তাই সে আমাকে সান্তনা দিলো এবং তার পিছে পিছে যেতে ইশারা দিলো। আসরের নামায পড়ে আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম। চলতে চলতে সন্ধ্যা হলো। সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে আমরা একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। বস্তুতঃ এটিও একটি মুসাফিরখানা ছিলো। আফগানীদের একটি দল এখানে অবস্থান করছিলো। আমার রাহ্‌বার পরিচয় করিয়ে দিলো। যার সাথে পরিচয় করালো, সে একজন আফগান ছাত্র ছিলো। কয়েক বছর যাবত সে কুড়ির উর্ধ্বে তুর্কিস্তানীকে আফগানিস্তানে নিয়ে গেছে। সে বলতে লাগলোঃ

আল্লাহ চাহে তো তোমাকেও দারুল ইসলামে নিয়ে যাবো। আমার সাথে তোমার আরো দু'জন দেশী আছে। কাল রাতে আমরা ইনশাআল্লাহ রওয়ানা হয়ে যাবো। কাল মাগরিবের পূর্বেই এখানে এসে যেও।

সকাল-সকাল সামানাপত্র নিয়ে মুসাফিরখানার মসজিদে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যার সময় আমার রাহবারও এলো। তার সাথে দু'জন ফারগানী যুবক রয়েছে। তাদের কাঁধে পানির ছোট ছোট মশক লট্‌কানো রয়েছে। পায়ে চামড়ার জুতা। আর মাথায় আফগানী টুপি। দু/এক ঘন্টা তৈরী হতে লাগলো। মুসাফিরখানা মুসাফিরে ভরপুর। সবাই আফগানী। লেবাস-পোষাকে আমরা তুর্কীমান মনে হচ্ছিলাম। আফগানিস্তানে যেহেতু তুর্কীমানও থাকে, তাই কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করছে না। কিন্তু তবুও মনটা ধুক ধুক করতেছিলো।

মাগরিবের নামাযের পর আমরা এক-একজন করে মসজিদ থেকে বের হলাম। আনুমানিক দশটা নাগাদ আমরা শহর থেকে বহুদূরে চলে এলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি শহর অনেক দূরে চাদরে পেচানো পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখাচ্ছে। সামনে এলো পাথুরে ময়দান। যার কোন কুল-কিনারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। ময়দানে পা রাখার সাথে সাথে রাহবার সাহেব বলে দিয়েছেন যে, আমরা চারজনই পৃথকভাবে সফর করবো। দু'জনের মাঝে আনুমানিক দুই'শো গজের দূরত্ব থাকবে। এটা খুব জরুরী, যাতে কমিউনিষ্টদের দালালরা যদি সামনে পড়ে যায়, তখন সবাইকে ধরা না পড়তে হয়। ব্যস্ততম এই রাস্তাটি আমাদের ডানে থাকবে। আমরা সড়কের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলবো। তবে সড়ক অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে চলবো। অন্যথায় সামনে গিয়ে যখন মরুভূমি শুরু হবে, তখন দিক ভুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আমরা রাহবারের কথা অনুযায়ী কাজ করলাম। বড় সড়ক ছেড়ে একটু বাম দিক দিয়ে চলতে থাকলাম। সর্বাগ্রে রাহবার চলছিলো। তারপর দু-তিন'শো গজ দূরত্বে আমরা ছিলাম। চলতে চলতে একটি নদীর কুলে উপণিত হলাম। দু'শো কদম দূরে একটি কাঠের পুল। ব্যস্ততম রাস্তাটি এরই উপর দিয়ে গেছে। আমাদের রাহবার আমাদেরকে পরামর্শের জন্য এবং কোন বিপদ সংকেত দেয়ার জন্য কিছু সাংকেতিক আওয়াজ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই আওয়াজ জঙ্গলের কোন জানোয়ারের আওয়াজের মতো ছিলো। নদীর কাছে পৌঁছে রাহবার সেই আওয়াজে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ আমরা জমা হয়ে গেলাম। অবস্থা এই ছিলো যে, পুলের উভয় দিকে সশস্ত্র পাহারাদার ছিলো। তাদের সাথে একটি কুকুরও ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে পাহারাদাররা সবাই ঘুমাচ্ছিলো। এমনকি কুকুরটিও ঘুমাচ্ছিলো। পরামর্শ হলো, দু'জন পাহারাদারকে পাহারা দিবে। আর দু'জন পুল পার হয়ে গিয়ে ওপারের পাহারাদারকে পাহারা দিবে। এর মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে, সাথে সাথে অবশিষ্ট দুই সাথীও পার হয়ে যাবে।

কিন্তু খোদা নাখাস্তা যদি কুকুর কিংবা কোন পাহারাদার জেগে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ উভয় পাহারাদারের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে শেষ করার চেষ্টা করা হবে।

তিনজন সাথী নিরাপদে পার হয়ে গেছে। চতুর্থজন পার হয়ে যাওয়ার সময় জংলী একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে সশব্দে পড়ে গেলো। সাথে সাথে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। পাহারাদারও জেগে গেলো। আমরা তড়িঘড়ি জঙ্গলের ভিতরে চলে গেলাম। কুকুর চুপ হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গহীন জঙ্গলের ভিতরে পৌঁছলাম। একেবারে ভুতুরে পরিবেশ। নীরব-নিস্তব্ধ। তবু চলতে থাকলাম।

আনুমানিক এক-দেড় ঘন্টা চলার পর জানতে পারলাম যে, রাহবার দিক ভুলে গেছেন। সারা রাত রাস্তার তালাশে চলতে থাকলাম। সকাল হলে একটি টিলা দেখা গেলো। তার পাদদেশে গিয়ে থেমে গেলাম। ফজরের নামায পড়লাম। এরপর একটি বৃক্ষের ছায়ায় কিছু বালু খুড়ে গর্ত করে তাতে শুয়ে পড়লাম। সারাদিন সেখানে পড়ে রইলাম। কারখী থেকে রওয়ানা হওয়ার পর থেকে উড়ে এসেও একটি দানা মুখে যায়নি। শুধু মাঝে মাঝে পানি পান করেছি। আবার রাত হলো। রাহবার বললেনঃ "রাস্তার দিক জানা জরুরী। অন্যথায় এই জঙ্গলে মরে যেতে হবে"।

সারারাত চাঁদনীর মধ্যে চলতে থাকলাম। পরের দিনও গত হলো। রাতভর সফর করলাম। সকালে একজন সাথী নিঢাল হয়ে গেলো। তার চলার মতো কোন ক্ষমতা রইলো না। পানিও শেষ। পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে একস্থানে দিন কাটানোর জন্য থেমে গেলাম। আমাদের রাহবার আমাদেরকে রেখে অনেক দূরে চলে গেলেন। দু'ঘন্টা পরে এসে বললেন, অনেক দূরে কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছে। দু/তিন ঘন্টার দূরত্ব হবে। আশা করা যায় সেখানে পানি পাওয়া যাবে। আর রাস্তারও দিক জানা যাবে। কিন্তু এখন বিরাট প্রশ্ন হলো, সে পর্যন্ত পৌঁছবো কিভাবে। কারণ একজনের তো হাটার মতো কোন শক্তি ছিলো না। রাহবার চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলেন। অসুস্থ্য সাথী বললোঃ ভায়েরা! আপনারা আমাকে এখানে রেখে চলে যান। আল্লাহ সহায়। এখানে আমার যা হবার তাই হবে। আমরা তাকে ছেড়ে যেতে চাইলাম না। আবেগ তাড়িত হয়ে সবাই দু'আ করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ দু'আ করলাম। দু'আর পর মনের মাঝে যেন এক অলৌকিক উজ্জীবনী শক্তি অনুভব করলাম। রাহবার আল্লাহর নাম নিয়ে অসুস্থ্য সাথীকে কাঁধে উঠিয়ে নিলেন।

আমি এখনো ভেবে তাজ্জব হয়ে যাই যে, তারই মতো একজন যুবককে কিভাবে সেদিন রাহবার কাঁধে নেন। অথচ কয়েকদিনের অনাহারে ক্ষুৎ-পিপাসায় কারত। উপরন্তু ধারাবাহিক মরুপথে পদব্রজে সফররত। অবশ্য তার সামানাপত্র আমি নিয়েছিলাম।

রাহবার তো দু'ঘন্টার আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু আনুমানিক সোয়া ঘন্টায় সেখানে পৌঁছে গেলাম। আসলে সেটি গাছ নয়, টিলা ছিলো। এখনও আধা মাইল দূর ছিল, আরো একজন সাথী নিঢাল হলো। রাহবার তাকে সেখানে রেখে একজন সাথীকে নিয়ে টিলার দিকে যাত্রা করলেন। সেই সাথীকে রেখে এসে এ সাথীকে নিয়ে গেলেন। সাথীদের অবস্থা আশংকাজনক ছিলো। পিপাসায় জিহ্বা বের হয়ে গিয়েছিলো। রাহবার হাত দিয়ে তাদেরকে বাতাস করছিলেন। আমি বেশ কষ্টে টিলার উপর উঠলাম। দেখি অনেক টিলা। আর অদূরে দুই টিলার মাঝখানে একটি সমতলভূমি।

টিলা থেকে নীচে নামলাম। সেই সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। আল্লাহর নাম নিয়ে খঞ্জর দিয়ে মাটি খুরতে আরম্ভ করলাম। একটু পরেই ভেজা কাদা বের হলো। আরো একটু পরে পানি বের হলো। দেখতে দেখতে গর্তটি ভরে গেলো। খুশিতে সেখানে থেকেই পানি পানি করে চেচিয়ে উঠলাম। সাথীদের কাছে ছুটে এলাম। মশক-ডোল কাঁধে উঠলাম। গিয়ে দেখি যে গর্তটি পানিতে ভরে গেছে। কিছু পানি নিজে পান করলাম। কিছু সাথীদেরকে পান করালাম এবং তাদের মুখে-চোখে পানি ছিটিয়ে দিলাম। পানি পান করে যেন পুনর্জীবন ফিরে পেলাম। রাহবার ও আমি আনন্দে খোদার দরবারে সিজদায় লুটে পড়লাম।

পানির উসিলায় জীবন বেঁচে গেলো। এখানে একদিন-একরাত থাকলাম। অল্প কিছু ছাতু ছিলো। নিজেও খেলাম। সকল সাথীদেরকে খাওয়ালাম। আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো। অসুস্থ্য সাথীরাও সুস্থ্য হলো। মশক ভরে পানি নিয়ে টিলা পেরিয়ে সমতল ভূমির দিকে যাত্রা করলাম। সমতল স্থানে পৌঁছে দু'ঘন্টা আরাম করলাম। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম। বেশ কিছুদূর গেলাম। সকাল হলো। আমরা তাবু টানালাম। এখন এমন একটি এলাকায় রয়েছি, যেখানে প্রায় সমতলভূমি। কদমবৃক্ষে ভরপুর। পাখীরা কিচিরমিচির করছে। রাহবার পথের সন্ধানে বের হলেন। দুপুরের পূর্বে ফিরে এসে বললেনঃ পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা বেকার শুধু মরুভূমিতে চক্কর কেটেছি। কারখী এখান থেকে মাত্র দু'দিনের পায়দাল দূরত্বে অবস্থিত। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আরোহী নিয়ে আসি। কিন্তু সাথীরা কারখী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাই অগত্যা কারখী ফিরে এলাম।

সাত দিন আট রাত আনোয়ারদী মরুভূমিতে চক্কর কাটার পর কারখী ফিরে এলাম। শহরের দু'মাইল দুরত্বে আমি সাথীদের থেকে বিদায় নিলাম। রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত পথে-ঘাটে অবিবাহিত করলাম। যদিও অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম, তবুও মনে কোন ক্ষোভ বা বিচলতা নেই। ইস্তেখারা করলাম। মনটা আরো শান্ত হলো। মেহমানখানার মসজিদে পৌঁছলাম। যোহরের নামায পড়লাম। জামাআত আগে হয়ে গিয়েছে। তাই একাকী নামায পড়তে হলো। সুন্নাত নামায পড়ার পর দেখি একটি লোক আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সন্দেহ হলো। গোয়েন্দা হতে পারে। নামায শেষ করে হাত উঠালাম; দু'আ করলাম দীর্ঘক্ষণ। এতোক্ষণ লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে আমার কাছে এলো, দু'আ শেষে উঠে দাঁড়াতে লাগলাম, লোকটি আমার হাত ধরে বসিয়ে দিলো। জিজ্ঞাসা করলোঃ

– এখানো কিভাবে এসেছো?

– আমি তো সব সময় এখানে আসি।

– তুমি কি উটের রাখাল?

– না, আমি কৃষক; কৃষিকাজ করি।

– তোমাকে তো এ এলাকার বলে মনে হচ্ছে না।

– হ্যাঁ! আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

– এই মেহমানখানা তো আফগানী মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। এই মসজিদেও একমাত্র তারাই নামায পড়ে। অন্য কোন লোকের এখানে আসা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। তুমি কেন, কার অনুমতিতে এখানে এসেছো?

– (এবার আমি অনেকটা ধারণা করে নিলাম যে, লোকটি গোয়েন্দা এবং কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। তাই এখন আর পালাবার উপায় নেই। তারপরও আমি বিচলিত না হয়ে মনোবল রেখে বললামঃ) আপনি যদি আমার সম্পর্কে কোন কিছু জানতে চান, কোন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে চান, তাহলে কোন অফিসে নিয়ে চলুন। আল্লাহর ঘর মসজিদের বে-ইজ্জতি করা ঠিক হবে না। সুতরাং আমি মসজিদে কোন কিছু বলতে পারবোনা।"

লোকটি হেসে ফেললো। এরপর বললোঃ

– তুমি কি আফগানিস্তান যাওয়ার ইচ্ছে রাখো?

– অবশ্যই।

– কোন টাকা-পয়সা আছে?

– কতো টাকা লাগবে?

– একটি গাধার দাম পরিমাণ।

– একটি কেন, আমি আপনাকে দুটি গাধা কেনার দাম দিবো।

– ব্যাস, ব্যাস, ঠিক আছে তুমি আমার সাথে এসো।

তার পিছে পিছে চললাম। মেহমানখানার একটি কামরায় নিয়ে গেলেন। কামরায় আরো তিনজন লোক বসা ছিলো। তারা লোকটিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলো। সবাই দৌলত আগা (স্যার)! বলে সম্বোধন করছিলো। শিক্ষিত লোক। ফারসী-আরবীতে ভালো পাণ্ডিত্য রয়েছে। তুর্কামান ভাষাও ভালো জানে। অন্যান্যেরাও স্যার বলে ডাকছিলো। দৌলত আগা হুকুম দিলো, এ নওজোয়ানের জন্য একটি চাপান আনো। চাপান তুর্কামানদের উষ্ট্রচালকদের একটি বিশেষ ধরনের পোষাক । একজন লোক উঠে গিয়ে একটি চাপান আনলো। আমি সেটি পরলাম। দেখতে হুবহু তুর্কামান উষ্ট্রচালকের মতো দেখাচ্ছিলো। দৌলত আগা আমাকে দেখে হাসলেন।

দুটি গাধা কেনা হলো। পরের দিন দৌলত আগার পঞ্চাশটির মতো উট আসলো। আমি অন্যান্য তুর্কামান উষ্ট্রচালকদের সাথে চললাম। দৌলত আগা সাথে ছিলেন না। দু' ঘন্টা সফর করার পর একটি বিরাট কিল্লার মতো বাড়ীতে উপণিত হলাম। ভিতরে ঢুকলাম। অসংখ্য তুত গাছ। দৌলত আগা গাছের ছায়ায় বসে আছেন। তার সাথে আরো দু'জন লোক। একজন বৃদ্ধ আলিম। আর অপরজন তুর্কামান নওজোয়ান। বুযুর্গ লোকটি অত্যন্ত স্নেহের সাথে কথাবার্তা বললেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে দৌলত আগা আমাকে বললোঃ এই বুযুর্গ, বুখারী উস্তাযও তোমার সাথে হিজরত করবেন। তোমাদের সাথে দু'জন তুর্কামানও যাবে। একটি গাধায় বুযুর্গ সওয়ার হবেন। আর একটি গাধায় তুমি সওয়ার হয়ো। সেই দুই তুর্কামানের মধ্যে একজন আমীর হবে এবং তার রাহনুমায়ীতে সফর হবে। কাফেলা রাতে যাত্রা করবে। দারুল ইসলামে পৌঁছে এই মেহমানখানার জন্য দু'আ করিও।

নির্দিষ্ট সময়ে কাফেলা যাত্রা করলো। তুর্কামান নওজোয়ান সফরের নিয়মাবলী বলে দিলো। দু'জন তুর্কামান যুবকের কাছেই রাইফেল ছিলো। আমরা কিছু দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলাম। একজন তুর্কামান সামনে। আর একজন পিছে। মেইন রোড থেকে একটু দূরে দিয়ে রাতে সফর করতাম। রাস্তায় দু'বার রাশিয়ান সৈন্যের মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছেন।

এখন আমরা সীমান্তের একেবারে নিকটবর্তী এসে পৌছেছি। আমাদের আমীর সাহেব আবারও কিছু নিয়ম-কানুন বলে দিলেন। আমাদেরকে এমন একটি স্থান দিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে, যেখানে অনেক দূরে দূরে ছোট ছোট ঝোপঝাড় ছিলো। জমিও খুব অসমান। সাপ-বিচ্ছুর তো কোন হিসাব নেই।

সুবহে সাদিক হচ্ছে। ঠিক এমনি এক শুভ মুহূর্তে আমরা সীমান্ত পার হয়ে দারুল ইসলাম আফগানিস্তানে পা রাখলাম। খুশীতে বিহবল হয়ে গেলাম। ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে তাঁর হামদ-সানা পাঠ করলাম। মনের অজান্তে বলে উঠলাম ঃ দারুল ইসলাম! তোমার মাটি আমার জন্য খাকে শিফা' হোক। তোমার বালুকণা আমার চোখের সুরমা হোক। মিল্লাতে আফগান! তোমরা কতো সৌভাগ্যবান ও সুখী। স্বাধীনতার মতো মহান নেয়ামত আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছে। জানিনা এর মর্যাদা তোমাদের কাছে আছে কিনা? আমরা তুর্কিস্তানের মুসলমান এর মর্যাদা তিলে তিলে অনুভব করছি। মহান রাব্বুল আলামীন তা-কিয়ামাত তোমাদেরকে এই নিয়ামত থেকে মাহরুম না করুক- আমীন!

বুখারা-সমরকন্দের রক্তাক্ত ইতিকথা আমি আর কতোটুকু লিখবো। যা লিখতে কলম শুকে যাবে, অসংখ্য কাগজ শেষ হবে। লেখকের চোখের পানিতে কাগজ ভিজে যাবে। আমি শুধু আমার ক্ষুদ্র জীবনের কিঞ্চিত জুলুম ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরলাম। যদি কোন গাইরাতমান্দ মুসলমান এ থেকে যৎ-সামান্যও শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যের সুতিকাগার বুখারা-সমরকন্দের হৃত গৌরর ফিরে আনার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং নিজ নিজ মুসলিম ভূমিকে সেই করুণ অবস্থা থেকে রক্ষায় সচেষ্ট হয়, তাহলেই আমার এই যৎ-সামান্য লেখা সার্থক হবে।

আন্দুখুয়ী (সীমান্তবর্তী শহর) শহরের কমিশনার আমাকে ফেরত পাঠাতে চাইলো। শহরের লোকজন চরম প্রতিবাদ জানালো। অবশেষে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তারপর অনেক কষ্টে হিরাত পৌছলাম। এখানে মাওলানা জামী (রহঃ)-এর মাজার রয়েছে। মাজারের জিয়ারত করলাম। আম্মাজানের ওসীয়ত মোতাবেক কুরআনে কারীমের কভার খোলার চেষ্টা করলাম; কিন্তু কভার খুব শক্ত ছিলো। শেষে একজন ছাত্র চাকু দিয়ে তা খুললো। কভার খুলে খুবই আশ্চর্য হলাম। দেখি অনেকগুলো আশরাকী (স্বর্ণমুদ্রা)। সেই মুদ্রাগুলো এই পরবাস জীবনে খুবই কাজে আসলো। সেগুলো দিয়েই এই উপ-মহাদেশে অর্থাৎ, হিন্দুস্তান পাকিস্তানে লেখাপড়ার ব্যয় বহন করলাম।

বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আযম হাশেমীর খোলা চিঠি

বিশ্বের মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আমার এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের গভীর থেকে উষ্ণ সালাম গ্রহণ করুন। আপনাদেরকে অনেক কিছু বলতে চাই। কিন্তু সীমাহীন আবেগের দরুণ কিছুই বলতে পারছি না। তবু যৎ-সামান্য কিছু বলা অতীব প্রয়োজন মনে করছি। ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

মুসলমান ভাই ও বোনেরা!

মুসলিম জাতি আজ নানাভাবে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও নিগৃহিত। মানবজাতি আজ দু'টি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ জালিম। আর এক ভাগ মজলুম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জালিম শ্রেণী কাফির। আর মজলুম শ্রেণী হলো মুসলমান। জালিম কোথাও ইয়াহুদী, কোথাও খৃষ্টান, কোথাও হিন্দু, আবার কোথাও বৌদ্ধ। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, মুসলিম নিধনে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল জালিম ঐক্যবদ্ধ। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতির অবস্থা হলো, তারা শতধাবিভক্ত। অথচ সকল মজলুম ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে জালিমের জুলুমের প্রতিরোধ করবে এটাই বিবেকের দাবি ছিলো। এই দুঃখজনক বাস্তবতার কারণে জালিমরা আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। তাদের জুলুমের প্রক্রিয়া ও পরিধি দিন দিন বেড়েই চলছে। তাই দেশে দেশে মুসলিম নিধন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জালিমদের ঐকবদ্ধ কর্মসূচীর এটি একটি অংশ। সুতরাং ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের দেশ স্পেনের মুসলিম নিধন, বৃহত্তর তুর্কী-রাশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার মূলোৎপাটন ও মুসলিম নিধন থেকে নিয়ে অপরাপর সকল জুলুম-নির্যাতন সবই এক অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।

একমাত্র ইসলামই তো আশরাফ-আতরাফের ভেদাভেদ ছিন্ন করেছে। ভৌগলিক সীমারেখার বিভেদ তুচ্ছ করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকার বলিষ্ঠ ঘোষণা দিয়েছে-কূ-নূ ইবাদাল্লাহি ইখওয়ানা–আল্লাহর বান্দারা সবভাই ভাই-হয়ে যাও।

এসব চাক্ষুস অবস্থা দৃষ্টে অকপটে বলতে হয়, মুসলমানরা আজ মুসলিম আদর্শচ্যুত হয়ে আদর্শহীনতার গভীর অমানিশায় নিমজ্জিত। ধর্মকে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে সীমিত করন, বিধর্মীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিপ্রীতি, পরনি র্ভবশীলতাসহ পতনের সকল মাধ্যম আমরা অনেক পূর্বেই গ্রহণ করেছি। মুসলিম জাতি এখনও যে বিশ্ব-মানচিত্রে আপন পরিচয়ে পরিচিত রয়েছে, এটা স্রেফ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও দয়া-অনুকম্পা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

চিন্তাশীল মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

এটা খুবই দুঃখজনক যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশে হয়তো নৈরাজ্যবাদী নতুবা স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। মুসলিম বিশ্ব সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল। সর্বত্র ক্ষমতার লড়াই চলছে। এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত অথবা বাস্তচ্যুত হচ্ছেন। সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। খাদ্যের অভাবে মানুষ মরছে। মুসলিম দেশগুলোর খাদ্যাভাব একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোকে শান্তি ও খাদ্যের জন্য অমুসলিম দেশের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। আমাদের জন্য এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী হতে পারে।

আমরা কি আমাদের জনগণকে শাসনে অক্ষম? আমরা কি ইসলাম ও আধুনিকতার সমন্বয়ে আধুনিক ধারণা ব্যবহার, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনায় অসমর্থ? আমরা আমাদের চারিদিকে তাকালে দেখবো যে, সত্যিই আমরা সরকার পরিচলার অযোগ্য। অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা শোচনীয় এবং দেশ অনুন্নত ও অস্থিতিশীল। মনে রাখা খুব দরকার যে, আধুনিক সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে রসুল (সাঃ)-এর সুন্নাহর মিল আছে, কিন্তু এর সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী সরকারের মিল নেই। অমুসলিম দেশগুলো যে ধরনের সরকার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, আমাদের সে ধরনের সরকার ব্যবস্থা মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই। সবকিছুতে যেমন ভালো, মন্দ দু'টি দিক থাকে, তেমনি সরকার ব্যবস্থায়ও ভালো-মন্দ দিক রয়েছে। তবে এর খারাপ দিকটি খুবই নিন্দনীয়।

আমরা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নৈরাজ্য ও নৈতিক ধস দেখতে পাচ্ছি। নৈতিক অধঃপতনের জন্য পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। তবুও কেন আমরা সেই গণতন্ত্রই বাস্তবায়নে আদাপানি খেয়ে মাঠে নামছি। বলা বাহুল্য, গণতন্ত্রের ভালো দিকগুলোর ব্যাপারে আমরা কখনও দ্বিমত নই, যে দিকগুলো আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিরোধী নয়, সেগুলো গ্রহণ করতে আমাদের বিন্দু মাত্রও দ্বিধা নেই।

ইসলাম এখনো মানব জাতিকে শান্তি ও বাঁচার পথ দেখাতে পারে, নিঃসন্দেহে একটি আধুনিক ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে, অধঃপতিত পাশ্চাত্য ব্যবস্থার বিকল্প একটি আর্দশ শাসন ব্যবস্থা হতে পারে, সেটা আমাদের কে দেখাতে হবে। সাথে সাথে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা যে সভ্যতা গড়ে তুলতে চাই, এর লক্ষ্য অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থা অথবা সভ্যতার সাথে সংঘাতে যাওয়া নয়। সমগ্র মানব জাতির অগ্রগতিতে অবদান রাখাই হবে সেই সভ্যতার লক্ষ্য। এ সভ্যতাকে অগ্রগতি ও নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্ম ও জাগতিক বিষয় এবং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির মধ্যে ভারসাম্য ও সঙ্গতি দেখাতে

হবে। এটাকে বিপথগামী বিশ্বের সামনে একটি বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে হবে। কাংক্ষিত সভ্যতা হবে স্থিতিশীল ও একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প। এর ভিত্তি হবে যুক্তি, স্রেফ অন্ধ বিশ্বাস নয়।

উলামায়ে কিরাম!

মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারীগণ! আপনাদের উপর আমার ও আমার মা-বাবার প্রাণ উৎসর্গ হোক। নবীজী (সাঃ)-এর মিম্বার ও মিহরাব আপনাদের দখলে। জাতি আজ আপনাদের রাহনুমায়ী পাণে তাকিয়ে রয়েছে। আপনারা যে জাতির রাহবার, এটা শ্রম, ত্যাগ, খিদমাত ও কুরবানীর মাধ্যমে প্রমাণ করা আপনাদেরই পবিত্র দায়িত্ব। জাতি যদি আপনাদের নেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেটা জাতির অপরাধের চাইতে নিজের অকৃতকার্যতার দিকে দেখা আমার মতে বেশি প্রয়োজন। নবী জীবনের মক্কী জিন্দেগীর এগারো বছরের মতো প্রথমে চেষ্টা-কুশেশ করে দেখুন, মাদানী জিন্দেগীর বিজয় আপনাদের পদচুম্বন করে কিনা। যদি এতে অকৃতকার্য হন, তাহলে মাদানী জিন্দেগী অনুসরণ অবধারিত। তবে মনে রাখা দরকার, নবী জীবনে যেমন, শি'আবে আবী তালিব এসেছে, বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন এসেছে, আপনাদের জীবনেও তা আসতে পারে। প্রভু বলেনঃ এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। –সূরা বাকারাঃ ১৫৫। অন্যত্র প্রভু আরো বলেনঃ তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর তারা এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যে, নবী ও তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলো তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্ত নিকটবর্তী। –সূরা বাকারা ঃ ২১৪।

বলাবাহুল্য, আজকে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমরা সত্যিই ইসলামের হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিনগুলো ফিরে পেতে চাই কিনা। অবশ্য আমরা সচেতন হয়ে উঠবো এবং এ সিদ্ধান্ত নেবো। ইন্‌শাআল্লাহ।

اللهم الفنا والف بين كلمتنا واصلحنا واصلح ذات بيننا وانصرنا

على القوم الكافرين - امين يارب العالمين *

সকলের দু'আ প্রার্থী

আযম হাশেমী

এই মুহূর্তে আপামর জন-সাধারণের কাছে সবিনয় নিবেদন করবো-যারা দেশকে বুখারা-সমরকন্দ বানানোর দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নে আদাপানি খেয়ে মাঠে নেমেছে; তাদের বেশভূষা দেখে, মিষ্টি মধুর শ্লোগান শুনে ও মায়া কান্নায় যেন ধোকা না খেয়ে যান। ওদের বাহ্যিক চাকচিক্য,জনোবল-মনোবল ও বাক-আড়ম্বরতা ইত্যাদি সবকিছু বদ্‌দ্বীনী, কুফ্‌র ও ইল্‌হাদের পানি সাদৃশ্য মরীচিকা বৈ কিছু নয়। দূর থেকে তা পানির সমুদ্র মনে হয়। আসলে তা পানির সমুদ্র তো দূরের কথা; বরং চির পানি কাংগাল খা-খা মরুভূমির মরীচিকা। মনে রাখা দরকার, স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃকুফরী শক্তি যতোটা ভয়াবহ, তার চেয়ে অধিক ভয়াবহ পশ্চিমাযাদা দ্বীনহীন ও দ্বীন-বিদ্বেষী মুসলমান। এরাই সমাজে মীর জাফর ও মীর কাসিম রূপে আবির্ভূত হয়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে তারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে নিলামে বিক্রি করতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না।

তাই সময় থাকতে প্রকৃত দেশ-জাতি ও স্বাধীনতা প্রেমিক জনতার উচিত, হিকমত ও মহব্বতের মাধ্যমে, নরমে-গরমে তথা দৃঢ়পদে ও সুকৌশলে সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম,স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব প্রীতি, আল্লাহ প্রীতি ও নবী প্রীতিভিত্তিক আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে দ্রুত এগিয়ে চলা। -ইন্ তান্‌সুরুল্লা-হা ইয়ান্‌সুরুকুম ওয়ায়ু সাব্বিত আক্বদা-মাকুম।

-সুরা মুহাম্মাদ ঃ ৭।

দেশ-জনতা প্রকাশনী ঢাকা